# শিবানন্দ-বাণী

## প্রথম ভাগ

স্বামী অপূর্বানন্দ
সংকলিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

# ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ও লীলাসহায়করূপে যাঁহারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাদিগের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে ও পরে তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে তাঁহার নিকটই মহাপুরুষ মহারাজকে আমি প্রথম দেখি। ইহা অনুমান ১৮৮৪ সালের অর্থাৎ ৫২।৫৩ বৎসরের কথা। তিনি তখন দেখিতে একটু লম্বাগোছের ছিলেন, এবং তাঁহাকে খুব তেজস্বী বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—'দেখ্, এখানে তো কত লোক আসে, কত ছেলে-ছোকরারাও আসছে, কিন্তু কাউকে তার বাড়ি কোথায়, বা বাবার নাম কি, এসব কিছু জিজ্ঞাসা করি নে। তোকে কিন্তু ঐসব কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, বল্ তো তোর বাড়ি কোথায়? তোর বাবার নাম কি?' তদুত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার পিতার নাম ও বাড়ির কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—'ও, তুই অমুকের ছেলে? তাঁকে তো আমি জানি। তিনি তো সিদ্ধপুরুষ। তা তোর হবে, তোর হবে।' আরো অন্যান্য কথাবার্তা সেইদিন হইয়াছিল।

ইহার পর নানা ঘটনা বিপর্যয়ে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কয়েক বৎসর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম—সে আজ প্রায় ৪১ বৎসরের কথা (১৮৯৭), ছুটির শেষে আমি বাঁকিপুর হইতে কর্মস্থলে যাইবার পথে বক্সার রেলওয়ে স্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফরমে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম যে, একজন গেরুয়াপরা সাধুও সেই প্ল্যাটফরমে বেড়াইতেছেন—দেখিতে বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান। দূর হইতে দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল ইনি নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধু। এই ভাবিয়া আমি নিকটে আসিতেই দেখি যে মহাপুরুষ মহারাজ! আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন, এবং বলিলেন যে তিনি ৺কাশী যাইতেছেন, ওখানে বংশী দত্তের বাড়িতে থাকিবেন। আমাকেও তথায় যাইতে বলিলেন। তাঁহার কথামত আমি ৺কাশীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও খুব আদরযত্ন করেন। তাঁহার নিকটে মঠের সব সংবাদ পাই।

ইহার কিছুকাল পরে আমি যখন আলমবাজার মঠে যোগ দিলাম তখন মহাপুরুষ মহারাজ দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি মঠে ফিরিয়া আসেন। সেই সময় তিনি কঠোর তপস্বীর ভাবে থাকিতেন। অল্প কথাবার্তা কহিতেন এবং খুব রাশভারী ছিলেন।

মহাপুরুষজী দীর্ঘকাল আলমোড়া ও কনখল প্রভৃতি স্থানে তপস্যা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে মঠে আসিতেন এবং কিছুদিন মঠবাস করিয়া পুনরায় তপস্যায় চলিয়া যাইতেন। তিনি খুব কঠোরী সাধু ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও সংযমাদি দেখিয়া বিবেকানন্দ স্বামীজী তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমৎ স্বামীজীর সহিত বুদ্ধগয়ায় অবস্থানকালে একদিন মহাপুরুষজী সমাধিতে এত মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন—'আপনি যেন বুদ্ধদেব', এবং ঐ কারণেও 'মহাপুরুষ' আখ্যা দেন।

শ্রদ্ধেয় প্রেমানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ হয় ১৯১৮ সালে। ইহার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব হইতেই মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ-পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২২ সালে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর মহাপুরুষজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হন। তিনিই সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। তখন হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা যেন আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি শত শত লোকের সহিত অক্লান্তভাবে মেলামেশা করিতে ও সকলকে ধর্মোপদেশাদি দিতে লাগিলেন। সকলের সঙ্গে মধুর ও অমায়িক ব্যবহার করা, প্রত্যেককে আদরযত্ন করা, সকলের খোঁজ-খবর লওয়া ও সব কাজকর্ম দেখাশোনা—এগুলি যেন তাঁহার নিত্যকার কর্ম হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার নিকট হইতে কেহই রিক্তহস্তে বা শূন্যপ্রাণে ফিরিয়া যাইত না। তিনি সকলের মনপ্রাণ ভরপুর করিয়া দিতেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাদি কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছে। বহু লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত, কিন্তু তথাপি তাঁহার অহংভাব মোটেই ছিল না। তিনি বলিতেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া সকলকে কৃপা করিতেছেন, তিনি ঠাকুর ও মাকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না। বালকের ন্যায় তাঁহার মুখে সদা 'মা, মা' বাণী শোনা যাইত।

শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতাহেতু তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপ অবিচলিতভাবে সে-সকল সহ্য করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহু দূর দূর স্থানের অনেক লোক তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাদ পাইবার জন্য আসিত। তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা করিতেন। পরের দুঃখকষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, অফুরন্ত কৃপাভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরানী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতর বসিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ।

যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, তিনি শরীরত্যাগের পর কোথায় যাইবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাইবেন, ঠাকুরের নিকট থাকিবেন এবং যুগে যুগে ঠাকুরের লীলাসহচররূপে তাঁহার সহিত আসিবেন। এখন তিনি স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকট সূক্ষ্মশরীরে আছেন ও সকলের কল্যাণ করিতেছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস।

বর্তমান গ্রন্থে মহাপুরুষ মহারাজের যে-সকল উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে সেই-সকল অমূল্য উপদেশ শ্রীভগবানের পূত আশীর্বাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত ও সাধকদিগের অশেষ কল্যাণের নিদান হইবে। এই গ্রন্থপাঠে ভক্তগণের প্রাণে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
এলাহাবাদ
৭ অগস্ট, ১৯৩৭

**শ্রীবিজ্ঞানানন্দ**

## বেলুড় মঠ

কার্তিক, ১৩২৫ (অক্টোবর, ১৯১৮)

একটি যুবক ভক্ত স্বপ্নে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে সে বিষয়ে চিঠিতে জানাইয়াছিল। এখন তাঁহার অনুমতিক্রমে কিছুদিন মঠবাস করিতে আসিয়াছে। একদিন সকালবেলা মহাপুরুষজী সবেমাত্র ঠাকুরঘর হইতে ফিরিয়াছেন, এমন সময় সে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছে—মহারাজ, আপনি দয়া করে আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন; আমার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, আপনিই কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন। ইহা বলিতে বলিতে ভক্তটি অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাপুরুষজীর পদযুগল ধারণ করিল। তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন—বাবা, আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করছি ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমার ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম দিন দিন খুব বর্ধিত হোক। তুমি তাঁর দিকে খুব এগিয়ে যাও। দীক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে—আমি কাউকে দীক্ষা দিইও নি। আমার ভিতর গুরুবুদ্ধি ঠাকুর আদৌ দেন নি। আমি তাঁর সেবক, তাঁর দাস, তাঁর সন্তান। তা ছাড়া দীক্ষা দেবার জন্য ঠাকুরের কাছ থেকে কোন আদেশ এখনো পাই নি। আমি জানি 'রামকৃষ্ণ' নামই এ যুগের মহামন্ত্র। যে ভক্তিভরে পতিতপাবন যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করবে তার ভক্তি মুক্তি সবই করামলকবৎ। 'রামকৃষ্ণ' এ যুগের ডঙ্কামারা নাম। জীবের মুক্তির জন্য রামকৃষ্ণনাম জপই যথেষ্ট। আর কোন দীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে তো আমার মনে হয় না। যে কায়মনোবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় নেবে, তাঁর নাম জপ করবে, সেই মুক্ত হয়ে যাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—জীবকে মুক্তি দেবার জন্য।

ভক্ত—ঠাকুরের নাম তো যতটা পারি জপ করি। তাঁর কাছে প্রার্থনাও করছি। তিনি যে যুগাবতার ভগবান, তাতেও আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, আপনার কৃপা পেলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে—এই আমার দৃঢ় ধারণা।

মহাপুরুষজী—আমার তো কৃপা আছেই; নইলে এত বলছি কেন? খুব প্রার্থনা করছি, বাবা, তোমার কল্যাণ হোক। তাঁর দয়ায় তাঁর অবতারত্বে যখন তোমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, তখন আর কোন ভাবনা নেই। তুমি মহাভাগ্যবান—পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে ভগবানের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস হয়। তা যখন তোমার হয়েছে তখন আর ভাবনা কি? আমি বলছি, আমার কথা বিশ্বাস কর—তুমি এ ভববন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যাবে নিশ্চয়। খুব প্রাণভরে তাঁকে ডাক—কাতরে প্রার্থনা কর; তিনি তোমার ঐ বিশ্বাস আরো পাকা

করে দেবেন এবং ভক্তি-বিশ্বাসে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

ভক্ত—জপ কিভাবে করব? তার কি বিশেষ কোন নিয়ম আছে?

মহাপুরুষজী—প্রীতির সঙ্গে বারংবার নাম করাই জপ। তাই করবে এবং করতে করতে আনন্দ পাবে। জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই, সব সময়—চলতে ফিরতে, খেতে শুতে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে। আসল জিনিস হলো—প্রেম। যত প্রেমভরে তাঁর নাম করবে তত বেশি আনন্দের অনুভূতি হবে। তিনি অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে, আর ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল প্রত্যক্ষ করবে। শিশু যেমন মা-বাপের কাছে আবদার করে, ঠিক তেমনি করে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম প্রার্থনা কর। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা—পতিতপাবন, কলিকল্মষহারী, পরমকারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময় প্রভু। খুব তাঁর নাম করে যাও। সর্বাবস্থায় যতটা পার ততটা জপ তো করবেই; কিন্তু বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে, নির্দিষ্ট একই স্থানে বসে জপ-ধ্যান করা খুব দরকার। তাই করো।

ভক্ত—ধ্যান কিভাবে করব, মহারাজ? ধ্যান করতে চেষ্টা করি; কিন্তু ধ্যান যে কি তা ভাল বুঝি না, আর ধ্যান তেমন হয়ও না।

মহাপুরুষজী—প্রথম প্রথম ধ্যান হওয়া একটু মুশকিল। তাঁর কৃপায় তাঁর নাম করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে যখন তাঁর উপর একটা ভালবাসা আসবে তখন ধ্যান অতি সহজে হয়ে যাবে। প্রথমটা ধ্যান করার চেষ্টা না করে চিরপবিত্র, কাম-কাঞ্চনবর্জিত, 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্', পরমকারুণিক, যুগাচার্য, জগদ্গুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তির সামনে বসে খুব কাতরভাবে বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। বলবে—'প্রভু, তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করে জীবত্রাণের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছ; আমি অতি দীন-হীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন; দয়া করে আমায় বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা দাও, আমার মানবজন্ম সফল হোক। তুমি কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও—আমায় দেখা দাও। তোমারই একজন সন্তান আমায় তোমার কাছে এইভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তুমি আমায় কৃপা কর।' এইভাবে প্রার্থনা করতে করতে তাঁর কৃপা হবে। তখন মন স্থির হয়ে আসবে—জপধ্যানে মন বসবে—হৃদয়ে প্রেম, আনন্দ অনুভব করবে, প্রাণে আশার সঞ্চার হবে। এইভাবে খুব প্রার্থনা করে পরে যেমন যেমন বলেছি সেইভাবে জপ করবে। তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে ধ্যান আপনিই ক্রমে হবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব একাগ্রভাবে ভাববে যে তিনি সস্নেহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। সেই ভাবনা এক ভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়াও একপ্রকারের ধ্যান। তুমি তাঁর নাম জপ করতে করতে প্রার্থনা করো, 'প্রভু, আমার ধ্যান যাতে হয় এমন করে দাও।' তিনি তাই করে দেবেন—নিশ্চয় জেনো। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা। যে-কোন রকমে প্রেমের সহিত তাঁর শ্রীমূর্তি চিন্তা বা তাঁর গুণ ভাবনা করাই

ধ্যান। এখন এইভাবেই করে যাও, পরে প্রয়োজনমত তিনিই ভেতর থেকে জানিয়ে দেবেন কিভাবে ধ্যান করতে হবে। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক—খুব কাঁদ। কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়ের সব মালিন্য দূর হয়ে যাবে, আর তিনি কৃপা করে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। এসব একদিনে বা হঠাৎ হয় না। করে যাও, ডেকে যাও—নিশ্চয়ই তাঁর সাড়া পাবে, আনন্দ পাবে।

ভক্ত—ব্যাকুলতাই তো আসে না। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা কিভাবে বাড়ানো যায়, মহারাজ?

মহাপুরুষজী—ব্যাকুলতা, বাবা, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। তা আপনা হতেই আসে—সময়ে। ভগবানের জন্য প্রাণে যত বেশি অভাব বোধ করবে, ততই হৃদয়ে ব্যাকুলতা বাড়বে। যদি তা না আসে তো জানতে হবে যে, এখনো সময় হয় নি। মা জানেন কোন্ ছেলেকে কখন খাওয়াতে হবে। মা কোন ছেলেকে হয়তো দেরি করে খাওয়ান। তার কি যে কারণ তাও তিনিই জানেন। প্রভুই মা। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে থাকতে হবে। তিনি তো আর জাগতিক মায়ের মতো নন? তিনি অন্তর্যামী। কোন্ ছেলে আন্তরিকভাবে তাঁকে দেখতে চায় তা ঠিক জানেন তিনি এবং সময়মত দর্শনও দেন। খুব ডেকে যাও, খুব তাঁর নাম করে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে থাক—যখন যা দরকার তিনিই সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান শীঘ্র প্রকটিত হন। কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমার ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন বড়ই মধুর। ঠাকুর পবিত্রহৃদয় ও বিষয়বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যাদের মনে বিষয়ের দাগ লাগে নি তাদের শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আর দরকার—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন যেমন তোমায় বললাম, সরল প্রাণে সব বিশ্বাস করে ঠিক তেমনিভাবে সাধনায় লেগে যাও; দেখবে তাঁর দয়া হবে—খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা, বাবা, সাধন করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো আর নেশা হবে না! সিদ্ধি আনতে হবে, পরিশ্রম করে ঘুঁটতে হবে, খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম কর, তাঁর ধ্যান কর, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর আন্তরিকভাবে; তবেই বাবা, আনন্দ পাবে।

ভক্ত—বড় আশা করে এসেছি যে, আমায় আপনি কৃপা করে দীক্ষা দেবেন। আপনি আমায় কৃপা করুন, মহারাজ।

মহাপুরুষজী—বাবা, তোমায় তো বলেছি যে দীক্ষা সম্বন্ধে এখনো ঠাকুরের কোন আদেশ পাই নি। তুমি দীক্ষার জন্য ভেবো না। আন্তরিকভাবে তাঁকে ডেকে যাও, তোমার প্রার্থনা তিনি শুনবেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। তোমার দীক্ষা নেবার যখন প্রয়োজন হবে তিনিই সব যোগাযোগ করে দেবেন নিশ্চয়। আমিও আন্তরিক প্রার্থনা করছি, 'প্রভুপদে তোমার পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভরতা আসুক; প্রেম, পবিত্রতায় তোমার

হৃদয় ভরে যাক, প্রভু তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন বর্ধিত করুন—খুব প্রার্থনা করছি।' এই বলিতে বলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে ভক্তটির মাথায় হাত দিয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন। ভক্তটিও প্রাণের আবেগে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিল। সে একটু শান্ত হইলে মহাপুরুষজী সস্নেহে নিজের হাতে তাহাকে ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিলেন।

ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বাগবাজারে মুখার্জি লেনের (বর্তমানে উদ্বোধন লেন) বাড়িতে ছিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজও সেখানে আছেন। আর বলরাম মন্দিরে ছিলেন শ্রীশ্রীমহারাজ ও পূজনীয় হরি মহারাজ। কয়েক দিন মঠে বাস করার পর ভক্তটি কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে ও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করাতে তিনি বলিলেন—নিশ্চয় যাবে, খুব যাবে। এত কাছে এলে আর তাঁদের দর্শন করবে না? তোমার মহাভাগ্য যে, এ সময়ে তাঁরা সকলেই কলিকাতায় রয়েছেন। এমন সুযোগ বড় একটা হয় না। প্রথম বাগবাজারে যাবে—মাকে দর্শন করবে। তিনি আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী; ঠাকুরের লীলাপুষ্টির জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন! তাঁর অবস্থিতি মাত্রেই জগৎ ধন্য হয়ে যাচ্ছে। মাকে আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। তাঁর ভাব এত চাপা যে, তাঁকে কে বুঝবে? তিনি মোটেই ধরা দিতে চান না। সাধারণ গৃহস্থের ঘরের মেয়েদের মতো থাকেন—সব কাজকর্ম করেন, ভক্তসেবা যেন তাঁর প্রধান কাজ! কে বলবে যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।' মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে খুব ভক্তি-বিশ্বাস প্রার্থনা করবে। তিনি প্রসন্না হলেই জীবের ভক্তি মুক্তি সব হয়। উদ্বোধনে শরৎ মহারাজও রয়েছেন—মায়ের মহা বীর-সেবক; তাঁকেও দর্শন করবে। তাঁকে বললেই তিনি মায়ের দর্শন করিয়ে দেবেন। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে পরে বলরাম মন্দিরে যাবে। সেখানে মহারাজ রয়েছেন, হরি মহারাজ আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার নাম করে বলবে যে, মঠ থেকে আমি তোমায় পাঠিয়েছি তাঁদের দর্শন করতে। তাঁরা খুব আশীর্বাদ করবেন। মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মনে করবে যে, ঠাকুরেরই আশীর্বাদ পেয়েছ। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তাঁর ভেতর দিয়ে জগৎ পাচ্ছে। হরি মহারাজ যেন সাক্ষাৎ শুকদেব, মূর্তিমান বেদান্তস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এঁরা স্থূল শরীরে যতদিন আছেন ততদিন মানুষ এঁদের দর্শন, পবিত্র সঙ্গ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। এর পরে এঁরা ধ্যানগম্য হয়ে যাবেন। তখন ধ্যান-বলে অতিকষ্টে এঁদের দর্শন পেতে হবে। এ বড় শুভ সময়। খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে এঁদের দর্শন করবে। এই যে এ কয়দিন মঠে রইলে ঠাকুরের স্থানে গঙ্গাতীরে, এত সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করলে, এ-সবই ধ্যান করবে। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তোমার ভাগ্য ভাল।

## বেলুড় মঠ

### ১১ কার্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩২৭ (২৮ অক্টোবর, ১৯২০)

সকালবেলা মঠের সাধুবৃন্দ নিত্যকার মতো ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সমবেত হইতেছেন। আজ তিনি যেন একটু বিশেষ গম্ভীরভাবে তদগতচিত্তে বসিয়া আছেন। কথাবার্তাদি তেমন কিছুই হইতেছে না। জনৈক সন্ন্যাসী কয়েক দিন হইল মঠের এক শাখাকেন্দ্র হইতে আসিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষজীর নিকট নিজ মানসিক অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন—মহারাজ, সাধনভজন তো যথাসাধ্য করছি, কিন্তু তেমন আনন্দ তো পাচ্ছি নে? প্রায়ই দেখি যেন routine work-এর (বাঁধাধরা কাজের) মতো সব করে যাই। এতে তো প্রাণের তৃপ্তি হয় না, আর শান্তিও পাই নে।

মহাপুরুষজী খুব শান্তভাবে বলিলেন—দেখ বাবা, শান্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয়। এ রাস্তা খুবই কঠিন—খুব thorny (কণ্টকাকীর্ণ)।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।'

—'ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ ও দুরতিক্রমণীয়, মনীষিগণ সেই (আত্মসাক্ষাৎকারের) পথকে সেইরূপ দুর্গম বলিয়া থাকেন।' এসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা। এ বড় দুর্গম পথ। বার থেকে যত সোজা বলে মনে হয়, ততটা সোজা নয়—অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি তাঁকে চাওয়া যায় তবে তাঁর কৃপা হয়, এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো তাঁকেই কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল? তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান লাভ হয়—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিন টান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা যদি কারো প্রাণে আসে তবেই তার ভগবান লাভ হয়, এবং তখনই ঠিক ঠিক আনন্দ ও শান্তি।

অবশ্য সে ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তাঁর কৃপা ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়—কেঁদে কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়—'প্রভু, দয়া কর, আমি সাধারণ মানুষ। তুমি দয়া করে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার দর্শন পাই! কৃপা কর, প্রভু। এই দুর্বলকে কৃপা কর'—এভাবে নিত্য প্রার্থনা করবে। যত তাঁর জন্য কাঁদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। তোমরা সাধু হয়েছ, তাঁর নাম করে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছ—তাঁর উপর তো তোমাদের দাবি আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে তাঁর উপর জোর করবে। দয়া

করবেন বলেই তো মা-বাপের কোল থেকে তিনি তোমাদের টেনে এনেছেন এবং তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর সঙ্ঘে স্থান দিয়েছেন। পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে তাঁর দুয়ারে। পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'গুরুকে দ্বারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।' স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনো প্রভুর বাড়ি ত্যাগ করে না, তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আর যাই কর, সে যেমন কখনো প্রভুর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো খেয়ে হোক, যো-সো করে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে তার হয়ে যাবে।

তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তাঁর সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ, তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না।' তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে ততদিন কোন ভয় নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন—নিশ্চয় জেনো। তোমরা ঠাকুরকে দেখ নি, কিন্তু আমাদের দেখছ। আমরা তাঁর পদাশ্রিত সেবক; আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছ। এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তোমরা খুবই fortunate (ভাগ্যবান)। কিন্তু এর পরের generation (পরে যারা আসবে তারা) তো আমাদেরও দেখতে পাবে না। সেইজন্যই স্বামীজী এ সঙ্ঘের সৃষ্টি করেছেন। এ সঙ্ঘ-শরীরে ঠাকুর বহু শতাব্দী ধরে জগতের কল্যাণের জন্য বর্তমান থাকবেন। এখন হতে এ সঙ্ঘ-শক্তিকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর কাজ করছেন। তোমরা সর্বদা মনে রাখবে যে, loyalty to the Sangha is loyalty to Thakur—সঙ্ঘকে মানলেই ঠাকুরকে মানা হলো। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই স্বামীজী নিজের হাতে এ মঠ স্থাপন করে গেছেন। আর আমরা যা বলছি তাও জগতের কল্যাণের জন্যই, তোমাদের ভালর জন্যই বলছি। আমরা তো আর লোক ঠকাতে আসি নি! যা ঠিক তাই বলি।

এখানে যারা আছে, সবারই দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। তোমারও কল্যাণ হচ্ছে। এইটে বিশ্বাস করো যে, আমাদের ঠাকুর বড় আশ্রিত-বৎসল। কায়মনোবাক্যে যারা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। তোমরা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে এখানে ভগবান লাভ করবার জন্য এসেছ, শান্তিলাভ করবার জন্য এসেছ। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁর মুখ চেয়ে পড়ে থাক। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণ করবেন, শান্তি দেবেন। তোমাদের কর্তব্য হলো তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলা। তোমরা সাধু; বিশেষ করে কামিনী ও কাঞ্চন, এ দুটো থেকে সর্বদা খুব তফাতে থাকবে। পবিত্রতা ও সরলতা, এই তোমাদের মূলমন্ত্র। ঠাকুর সব ক্ষমা করেন, কিন্তু 'ভাবের ঘরে চুরি' তিনি কখনোই ক্ষমা করেন না। যারা অন্য ভাব আশ্রয় করে বা কোনরূপ লুকোচুরি করে, ঠাকুর তাদের এ সঙ্ঘে রাখেন না, সরিয়ে দেন। এখানে সব খাঁটি লোক থাকবে।

সন্ন্যাসী—আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ঠাকুরের আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারি। আর মহারাজ, মনে অনেক সময় নানাপ্রকার বিকার আসে, তাতে ভারি অশান্তি বোধ হয়। এর জন্য কি কর্তব্য আপনি দয়া করে একটু উপদেশ দিন।

মহাপুরুষ মহারাজ সস্নেহে বলিলেন—তা বাবা খুব আশীর্বাদ করছি ঠাকুরের আশ্রয়ে থেকে তোমার মানব-জীবন ধন্য হয়ে যাক। মনের বিকারের কথা যা বলছ, ওসব দিকে বেশি নজর দিও না। জান তো ঠাকুর হলেন পবিত্রতার জ্বলন্ত বিগ্রহ। তাঁর শ্রীমূর্তি ভাবনা করলে আর তাঁর পবিত্র নাম জপ করলে দেখবে মনের সমস্ত বিকার লজ্জায় মাথা হেঁট করবে আর জোর করতে পারবে না। যখনই মনে কোনপ্রকার বিকার উপস্থিত হবে তখনই তাঁর কাছে কেঁদে প্রার্থনা জানাবে, 'প্রভু, আমি তো দুর্বল, আমায় রক্ষা কর। তুমি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে, আমি তো তোমারই আশ্রিত দাস।' এইভাবে তাঁকে সব জানাবে। তবেই তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন। তুমি খুব ভোরে ওঠ তো? খুব ভোর ভোর উঠবে। রাত তিনটে-চারটের পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? রাত্রে খুব সামান্য খাবে। তবেই দেখবে যে তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভেঙে যাবে, আর বেশ refreshed (সতেজ) বোধ করবে। ঠাকুর বলতেন, 'রাত্রের খাওয়া তো জলখাবার।' আমরা তো রাত্রে খুবই সামান্য খাই। ঠাকুরের কাছে যখন যেতুম তখন থেকেই ঐ অভ্যাস হয়ে গেছে।

এই সময় মঠের ভাণ্ডারী মহারাজ প্রণামান্তে মহাপুরুষজীকে বলিলেন যে, জনৈক ভক্ত তাঁহার মৃত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির জন্য কিছু টাকা দিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—ঠাকুর তো শ্রাদ্ধাদির অন্ন গ্রহণ করতে পারতেন না। অতএব এ বিষয়ে সেই ভক্তটিকে জানিয়ে দিও। আমরা জেনে শুনে কি করে তাঁর ভোগে এসব দিই? এ তো খেলার ঠাকুর নয়, আর মনগড়া বা কাল্পনিক ঠাকুরও নয়। এ যে বাবা, জ্যান্ত ঠাকুর বসে আছেন। কোনপ্রকারে অন্যায় হলেই তখনই জানিয়ে দেন।

## বেলুড় মঠ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ (নভেম্বর, ১৯২০)

আজ পূর্ণিমা তিথি। শান্তকোলাহল জগতের উপর সন্ধ্যা ধীরপদবিক্ষেপে নামিয়া আসিতেছে। দূরস্থ দেবালয়সমূহে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠেও মঙ্গলশঙ্খ আরতির আহ্বান জানাইয়া দিয়াছে। সাধুভক্তবৃন্দ ভক্তিনম্রপদে ঠাকুরঘরে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজও নিত্যকার মতো ঠাকুরঘরে গমন করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরের দক্ষিণপূর্ব কোণে একখানি মৃগচর্মাসনে উপবেশন

করিয়াছেন। যুক্তকর, ধ্যান-স্তিমিতনেত্র। আরতি আরম্ভ হইয়া গেল। আরতির বাজনা প্রশান্ত গম্ভীর ধ্বনিতে মনকে একাগ্র করিয়া তুলিতেছে; বিশেষ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সৌম্য মূর্তি প্রত্যেকের চিত্তকে অধিকতর অন্তর্মুখ করিতেছে। ক্রমে আরতি শেষ হইল। সমবেত সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশস্তি-গীতি আরম্ভ করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজও সকলের সহিত সুর মিলাইয়া সুললিত কণ্ঠে তন্ময়ভাবে আরাত্রিক গান গাহিলেন। গান শেষ হইয়া গেল। একে একে অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে ধ্যানাদি করিতে চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। মুখমণ্ডলে সমাধির প্রশান্তি ফুটিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল এইভাবে কাটিয়া গেল।

প্রায় ৮॥ টার সময় মহাপুরুষজী নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতেছেন। অস্ফুটস্বরে গান প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও প্রেমপূর্ণ। পূর্ব হইতেই কয়েকজন সাধু ও ভক্ত দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী নিজ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলে সকলে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঘর একপ্রকার নিস্তব্ধ; কাহারও যেন কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে না। আস্তে আস্তে সামান্য দু-চার কথা হইতেছে। ক্রমে সাধনভজন সম্বন্ধে কথা উঠিল। মহাপুরুষ মহারাজ তন্ময়ভাবে বলিলেন—রাত্রিই সাধনের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। ধ্যানজপ নিত্যই খুব নিষ্ঠার সহিত করতে হয়, তাতে মন শুদ্ধ হয়। কিছুকাল নিষ্ঠার সহিত ধ্যানজপ করলে হৃদয়ে নিরন্তর একটা ভগবদ্‌ভাব জাগরূক থাকে এবং একটা আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। ধ্যান করার পরেই আসন ছেড়ে চলে যেতে নেই, তাতে ভাব দৃঢ় হয় না; বরং ধ্যানভঙ্গের পরে নিজ আসনে বসেই অন্তত খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়। এর পরে ধ্যানের অনুকূল খুব ভাল ভাল স্তবাদি পাঠ করবে। তাতে ধ্যানের ভাব ও আনন্দ আরো ঘনীভূত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। আসনত্যাগের পরও খানিকক্ষণ কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলে আপন মনে অনেকক্ষণ স্মরণ-মনন করবে। তাতে অনুভব হবে, যেন সেই ধ্যানের নেশা লেগে রয়েছে। ওতে প্রাণে খুব আনন্দও এনে দেয় এবং একটা উচ্চ ভাব আশ্রয় করে থাকবার খুব সহায়তা করে।

জনৈক সন্ন্যাসী—মহারাজ, আমাদের পক্ষে, মধ্যে মধ্যে তপস্যাদির জন্য বাইরে যাওয়া তো দরকার? এবং তীর্থাদি পর্যটন বা পরিব্রাজকরূপে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ানো, এসবও তো সাধুজীবনের পক্ষে অনুকূল?

মহারাজ—বাবা, সাধারণ কথায় বলে, 'A rolling stone gathers no moss' (যে পাথর সর্বদা ঘুরছে তাতে শেওলা জমে না)। কেবল ঘুরে বেড়ালেই কি ধর্মলাভ হয়, না ভগবান লাভ হয়? তবে অহংকার, অভিমান নষ্ট করার জন্য বা শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা আনবার জন্য কখনো কখনো মাধুকরী করা বা নিঃসম্বল অবস্থায় নির্জনবাস করা বা সামান্য ঘুরে বেড়ানো ভাল। তাতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ

নেই। কিন্তু ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ঐসব করার কোন প্রয়োজন নেই। লাটু মহারাজ মাঝে মাঝে বলতেন, 'কোথায় ঘুরে বেড়াবি? শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান হোস তো এক জায়গায় বসে থাক।' ঠিক কথা। যার হেথায় আছে তার সেথায়ও আছে। আর ঘুরে বেড়াবে কোথায়, কেনই বা? তিনি যে অন্তরেই রয়েছেন। তাই তো ঠাকুর প্রায়ই এ গানটি গাইতেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাক কারো ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন সেই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে, ঐ চিন্তামণির নাচদুয়ারে।'

এই বলিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বারংবার মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাহিলেন, এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—গানের শেষটাতেই বিশেষ করে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া রয়েছে—'কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামণির নাচদুয়ারে।' তাঁর দুয়ারে সবই পড়ে আছে—ভক্তি, মুক্তি, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত, সবই। বাবা, তবে খুঁজতে হবে, ব্যাকুল হয়ে চাইতে হবে। এই খোঁজাই হলো সাধন-ভজন। আন্তরিক-ভাবে তাঁকে চাইলেই তিনি কৃপা করেন। আর তিনি কৃপা করে একটু দোর খুলে দিলেই, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা করে দিলেই দেখতে পাবে যে ভিতরেই সব রয়েছে। তবে তাঁর দয়ায় কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হবে না।

জনৈক ভক্ত—হাঁ, মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাই বলতেন যে, মূলাধার হতে সুষুম্নার পথ দিয়ে যখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে উর্ধ্বে ওঠেন তখনই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার খুলে যায়।

মহারাজ—হাঁ, ঠিকই। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা না হলে কিছুই হবার জো নেই। তাইতো ঠাকুর মার কাছে এত কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন, 'মা জাগ, মা জাগ—জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী।'

প্রথম পদটি আবৃত্তি করিয়াই মহাপুরুষজী নিজে গানটি গাহিতে লাগিলেন—

'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী, তুমি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিণী
প্রসুপ্তভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টিনী।
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী।
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী।।'

আহা! সে যে কি তন্ময়তা তাহা প্রকাশ করিবার নহে! ক্রমে ক্রমে তিনবার গানটি গাহিয়া মহাপুরুষজী চুপ হইয়া গেলেন। শান্ত মাধুর্যে তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত; সমস্ত ঘরটিতে যেন গানের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে; চারিদিক নিস্তব্ধ। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পরে মহাপুরুষজী খুব করুণস্বরে বারবার বলিতে লাগিলেন—মা, মা, জগজ্জননী! সে যেন মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দন!

ক্রমে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় আস্তে আস্তে বলিতেছেন—আহা! ঠাকুরের মুখে কত যে এ গানটি শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। কোন কোন দিন চামর নিয়ে মাকে ব্যজন করতে করতে এই গান করতেন। আহা, কি তন্ময় হয়ে না তিনি এই গানটি গাইতেন! আমরা সব স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। তাঁর বাহ্যিক কোন হুঁশ থাকত না। আস্তে আস্তে চামর দুলছে, আর মাতোয়ারা হয়ে তিনি গান গাইছেন! কি মধুর কণ্ঠই না তাঁর ছিল! সে যে কি ভাব তা বলে বোঝাবার নয়! সকলের প্রাণ একেবারে গলে যেত। এমন আকুল আহ্বানে কি মা না জেগে থাকতে পারেন? আর সেই মা-ই হলেন ব্রহ্মকুণ্ডলিনী। স্বামীজী বলতেন—'জানিস, এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে। Individual (ব্যক্তিগত) কুণ্ডলিনী তো জাগ্রতা হবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি?' তাইতো সমগ্র জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আর সেই আদ্যাশক্তিই জগতের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করছেন। এবার আর ভাবনা কি?

## ঢাকা
### ১৩২৮ (১৯২২)

১৯২২ সালের প্রথমভাগে মহাপুরুষ মহারাজ ঢাকায় গিয়াছিলেন। ঢাকা মঠে অবস্থানকালে ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ফরাশগঞ্জস্থিত 'গৌরাবাসে' ভক্তসম্মিলনে যোগদান করেন। মহাপুরুষজীর শুভাগমনের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় পূর্ব হইতেই বহু ভক্ত নরনারী ও মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা তথায় সমবেত হইয়াছেন। সম্মিলনের রীতি অনুসারে সর্বাগ্রে জনৈক ভক্ত একটি ভজনগান করিলেন—'রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে মজরে মনমধুপ মোর' ইত্যাদি। ভজনের পর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-পাঠ হইবার কথা থাকিলেও সমবেত সকলেই মহাপুরুষজীর উপদেশ শুনিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। তিনি কিন্তু 'কথামৃত'-পাঠে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাই পাঠ হইতে লাগিল। একস্থানে ঠাকুর সন্ন্যাসজীবনের কঠিন নিয়ম সম্বন্ধে বলিতেছেন—'সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না।'

ঐ সময় জনৈক ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, ঠাকুর তো বলেছেন যে সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখতে নেই; কিন্তু আমাদের তো নানা কাজকর্মে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভিতর আমাদের কিভাবে থাকতে হবে?

মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন—দেখ বাবা, বাড়িতে যখন ছিলে তখন মা-বোন ছিল তো? মা-বোনদের সঙ্গে যেমন সরল প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেইরকম মন নিয়ে এখন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজনমত কথাবার্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা তোমার মা-বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্তা না বলাই ভাল—বিশেষ করে আলাদাভাবে। পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারীজাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ জ্ঞান করবে। এই হলো সাধনা।

ব্রহ্মচারী—কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি করব, মহারাজ?

তদুত্তরে মহাপুরুষজী একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—যেখানে-সেখানে মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়ই, এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয়নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাবে না, স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই; সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে জীবন যাপন করে মনের ঐসকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস হলে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে!

আরো খানিকক্ষণ 'কথামৃত'-পাঠ হবার পরে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন—ভগবানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা কি?

মহাপুরুষজী—শাস্ত্রে তো ভগবানলাভের উপায় সম্বন্ধে নানাভাবের উপদেশ রয়েছে; কিন্তু শেষ কথা হলো শরণাগতি—শরণাগতি। শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে যোগ, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সব উপদেশ দিয়ে শেষটায় বলছেন—

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

এই হলো সমগ্র গীতার সারকথা। ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, 'ধর্ম অধর্ম সব পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও। তাহলে আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব।' ভগবানে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি একদিনে আসে না। এ বড় কঠিন ব্যাপার। যত পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, কঠোর সাধনা—সবই একমাত্র শরণাগতি আনার জন্য। সর্বোপরি চাই ভগবৎ-কৃপা। অনন্যমনে তাঁর ধ্যান, চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা করে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন।

*    *    *

অন্য এক সময়ে ঢাকা মঠের জনৈক কর্মী খুবই ভারাক্রান্ত প্রাণে মহাপুরুষজীকে নিবেদন জানিয়েছিলেন—রাজা মহারাজ আদেশ করেছিলেন, 'আর যাই করিস, সকাল-সন্ধ্যায় জপ করতে ভুলবি নি।' অথচ আমায় যে জাতীয় কাজ করতে হচ্ছে—ভজন ও ক্লাস ইত্যাদি—তাতে তো সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিনই সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে যেতে হয় এবং সন্ধ্যায় জপ করার আদৌ সময় হয় না। এতে মনে বড় অশান্তি হচ্ছে।

তদুত্তরে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন—দেখ, ঐ যে ক্লাস ও ভজন ইত্যাদি কর তা ঠিক জপধ্যানের মতো সাধনজ্ঞানে করবে। শ্রীভগবানের ভজন, তাঁর বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা—এ তো ভজন-সাধনেরই অঙ্গ। আর এই ভাবটি সর্বক্ষণ মনে জাগরূক রাখবে যে, তুমি তাঁরই কাজ করছ। তাঁর সেবাজ্ঞানে করলে এতে তোমার পরম কল্যাণ হবে। ক্লাস ইত্যাদি করে এসে যখনই সময় পাবে নিয়মিত জপধ্যান করতে বসবে—এমন কি শোবার পূর্বেও নিয়মিত জপটুকু করা চাই-ই। মহারাজের আদেশ ঠিক ঠিক পালন করতে হবে বই কি।

জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ঠাকুর বলতেন যে, বাসনার লেশমাত্র থাকলেও ভগবান লাভ হয় না—যেমন সুতোর একটুও ফেঁসো থাকলে তা ছুঁচের ভেতর ঢোকে না। কিন্তু আমাদের মনে তো অসংখ্য কামনা-বাসনা রয়েছে, আমাদের উপায় কি হবে?

*    *    *

মহাপুরুষজী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—উপায় আছে। চিত্তরূপ সুতোয় ভক্তিবিশ্বাসরূপ তেল জল মেখে কামনা-বাসনারূপ ফেঁসোগুলো বেশ করে রগড়ে নিলেই চিত্ত অনায়াসে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মগ্ন হবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক—তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রাণের আর্তি জানাও। তিনি বড় আশ্রিতবৎসল—শরণাগতকে কখনো ত্যাগ করেন না।

## বেলুড় মঠ

### ১৩২৯ (১৯২২, শেষের দিকে)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের চার-পাঁচ মাস পরে একদিন বিকাল বেলা জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনমানসে মঠে আসেন। তিনি অতি ভক্তিভাবে মহাপুরুষজীর পাদবন্দনা করিয়া মেজের উপর উপবেশন করিলেন এবং নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন—আমি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে রাজা মহারাজকে প্রথম

দর্শন করি এবং সে অবধি সুবিধা হলেই তাঁর নিকট আসতাম। তিনি আমায় খুবই দয়া করতেন এবং অনেক উপদেশাদি দিতেন। প্রাণে প্রাণে আমি তাঁকেই গুরুত্বে বরণ করেছিলাম এবং একদিন দীক্ষা নেবার অভিলাষ জানালে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—'দীক্ষা হয়ে যাবে, তবে এত তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন যেমন বলে দিচ্ছি তেমনি করে যান। মন তৈরি হোক—তারপরে সব হবে।' সেদিন তিনি সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উপদেশাদি আমায় দিয়েছিলেন। সে অবধি তাঁর নির্দেশানুসারে জপ-ধ্যান একটু একটু করতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁকে দর্শন করে যেতাম। কিন্তু আমি এমনই অভাগা যে, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পাবার সৌভাগ্য আমার হলো না। এখন আমার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা, আপনি কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন। আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত—তাঁর আসনে বসেছেন। তাঁর শক্তি এখন আপনার ভিতর দিয়েই কাজ করছে। আপনি কৃপা করুন, আমায় বিমুখ করবেন না।

মহাপুরুষজী ঐ ভক্তটিকে পূর্বে কখনো দেখেন নাই; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে খুব পরিচিত আপনার জনের ন্যায় সস্নেহে বলিলেন—আপনি মহাভাগ্যবান যে, মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেছেন এবং তিনি দয়া করে আপনাকে অনেক উপদেশাদি দিয়েছেন। তিনি যা বলে দিয়েছেন তাই মন্ত্র বলে জানবেন। তাতেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আর আলাদা করে দীক্ষা নেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে তো আমার মনে হয় না। খুব কাতর প্রাণে ডাকুন, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করুন—নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি আপনাকে দীক্ষাও দেবেন। তাঁর কৃপা অমোঘ। তিনি তো আর সাধারণ সিদ্ধ গুরু নন? তিনি হলেন স্বয়ং ভগবানের পার্ষদ। তাঁদের কৃপাকটাক্ষে জীবের সংসারবন্ধন মুক্ত হয়—সাধক সিদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান যখন জীবকল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন তখনই তাঁরা শ্রীভগবানের সঙ্গে আসেন যুগধর্মপ্রচারের জন্য—ভগবানের নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য। পৃথকভাবে তাঁরা জগতে বড় একটা আসেন না। তা ছাড়া তিনি গেছেন কোথায়? পাঞ্চভৌতিক দেহটা ছেড়েছেন বই তো নয়। এখন তিনি চিন্ময়ধামে চিন্ময়দেহে ঠাকুরের সঙ্গে রয়েছেন এবং ভক্তদের অশেষ কল্যাণ করছেন। আমি বলছি—আপনি নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবেন।

ভক্ত—মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা অতি সত্য। আমিও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর আমার প্রাণে নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এই ভেবে যে, অমন সদ্‌গুরুর সঙ্গ পেয়েও তাঁর কৃপালাভ আমার অদৃষ্টে হলো না! মন খুবই অশান্ত হয়েছিল। ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিন দিন হলো স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছি এবং তিনি কৃপা করে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারি নি। খুব চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই তা স্মরণ হলো না। সেই থেকে

মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। শেষটায় অনন্যোপায় হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনাকে দয়া করে এর একটা উপায় করতেই হবে। আমার বিশ্বাস তিনি আপনার ভিতর দিয়েই আমার এ অভাব পূরণ করে দেবেন।

ইহা বলিতে বলিতে ভক্তটি খুব ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী ধীরভাবে ভক্তটির সব কথা শুনিতেছিলেন। এখন এতাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল করুণায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন—মহারাজ যখন আপনাকে এতটা দয়া করেছেন তখন আপনার কোন ভয় নেই; তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি হতাশ হবেন না। যখন সময় হবে, তিনি পুনরায় আপনাকে দর্শন দিয়ে কৃপা করবেন। খুব কাতর প্রাণে তাঁকে ডেকে যান।

কিন্তু ভক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাসবাণীতে শান্ত না হইয়া মন্ত্র দিবার জন্য তাঁহারই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অগত্যা কতকটা যেন সম্মত হইয়া তাঁহাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। (তখনো শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্মিত হয় নাই। মঠে মহাপুরুষজীর ঘরের পাশে যে ঘরে মহারাজ থাকিতেন সে ঘরেই তাঁহার ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং সেখানে নিত্য পূজা হইত।) প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলিয়া সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসিবার ইঙ্গিত করিলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নিজ তক্তপোশের উপর চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর হইতে আসিয়া মহাপুরুষজীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া গদগদস্বরে বলিলেন—আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে রাজা মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভিতর রয়েছেন—এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি! এই আশীর্বাদ করুন যেন এ জীবনেই ইষ্টদর্শন হয়।

মহাপুরুষজী—আপনি মহাভাগ্যবান। পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতি আছে বলেই আপনাকে মহারাজ নানাভাবে এত কৃপা করেছেন। এখন যে বস্তু পেলেন তা নিয়ে সাধন-ভজনে ডুবে যান। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। প্রকৃত ভক্ত সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাকে; আর কেঁদে কেঁদে ডাকে—তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়। তিনিই জানেন তাঁর ভক্তকে কখন দর্শন দিতে হবে। তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকুন, আর কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস ও প্রেম-প্রীতির জন্য প্রার্থনা করুন; তিনি আপনার হৃদয় পূর্ণ করে দেবেন।

ভক্ত—ধ্যান-জপ কিভাবে করব সে সম্বন্ধে একটু উপদেশ দিন। সংসারে নানা কাজের ভিতর সর্বদা জড়িত থাকতে হয়। তা ছাড়া চাকরির দায়িত্বও ভীষণ। এসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাতে ভগবানকে ডাকতে পারি তাই আশীর্বাদ করুন।

মহাপুরুষজী—আমাদের আশীর্বাদ তো আছেই। আপনাকেও একটু রোক করে ভজন-সাধনে লাগতে হবে। আজ যে মন্ত্র পেয়েছেন তাই নিয়মিতভাবে জপ করে যান; আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—'প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই করে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা ও জীবের সর্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে তারা সবই দু-দিনের—চিরসাথী একমাত্র তিনিই।

আপনি একমনে খুব নাম জপ করে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও এক রকমের ধ্যান। ধ্যানের বহু রকম আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে আপনার হৃদয়কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে, ক্রমে ক্রমে মূর্তিরও লয় হয়ে গিয়ে কেবল চৈতন্যময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে—এও একপ্রকারের ধ্যান। আরো কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন। আসল কথা হলো আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কিভাবে ডাকতে হবে—সে-সব ভিতর থেকেই জানতে পারবেন। ঠাকুরের কথায় পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন-ভজন করা। তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন—যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, তেমনি। একটু করে দেখুন—তবেই তাঁর কত কৃপা তা অনুভব করতে পারবেন।

ভক্ত—সংসারে কিভাবে থাকতে হবে তা সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। সকলের মন জুগিয়ে চলা, এ এক মহা কঠিন ব্যাপার।

মহাপুরুষজী—ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়েছেন তো? বেশ ভাল করে পড়বেন। এসব সমস্যার অতি সুন্দর সমাধান ঠাকুরের নিজের কথায়ই পাবেন। এ সংসার তো আমারও নয়, আপনারও নয়। এ সংসার সৃষ্টি করেছেন ভগবানই। যাদের আপনি 'আমার' বলে মনে করছেন তারা সবই ভগবানের—এই ভাব নিয়ে সংসারে থাকতে হবে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন—সবই ভগবানের জীব। তাদের যতটা সেবা করবেন তা ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধিতেই করতে হবে—তা হলে আর বেশি জড়িয়ে পড়তে হবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে চাই বিচার। সদসৎ-বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়। আপনারা গৃহস্থাশ্রমে

রয়েছেন—বেশ তো। তা বলে খুব বেশি জড়িয়ে পড়তে হবে কেন? সকলের প্রতি যতটুকু কর্তব্য আছে ততটা অবশ্য করবেন—তাও সেবা-জ্ঞানে। আপনার উপর তো ভগবানের অশেষ দয়া। কত লোক 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়—পেটের চিন্তায়ই অস্থির, ভগবানকে ডাকবে কখন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া-পরার ভাবনা করতে হয় না—এ কি কম দয়া? যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, ভগবান তাদের সব সুবিধে করে দেন।

রাত্রিই হলো সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট সময়। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে সেই সময় গভীর রাতে উঠে একান্তমনে ভগবানকে ডাকবেন—তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। খুব কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রাণের বেদনা জানাবেন। মহানিশায় সাধন-ভজনে ডুবে যাবেন। আপনার লক্ষণ ভাল—আপনার হবে; তাই এত করে বলছি। প্রথমটায় বেশ জোর করে খাটুন, দেখবেন বিমল আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে—আনন্দের নেশায় মশগুল হয়ে যাবেন। জাগতিক ভোগে কি ছাই আনন্দ আছে? ভগবদানন্দের এক কণাও যদি কেউ পায় তো তার কাছে এ সংসারসুখ আলুনি বোধ হয়।

ভক্ত—জপ সংখ্যা রেখে করতে হবে কি? কত জপ করব, কিভাবে করব, তা দয়া করে একটু বলে দিন।

মহাপুরুষজী—জপ তিন রকমে করা যেতে পারে। মালাতে, হাতের করে বা মনে মনে। মনে মনে জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। জনৈক মহাসাধক বলেছেন—'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন মন জপে তো বলিহারি যাই।' মনে মনে জপ করার অভ্যাস করলে চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে সব সময়ই জপ করা যেতে পারে। কিছুকাল ঐভাবে সর্বক্ষণ মানস-জপের অভ্যাস করে নিতে পারলে দেখবেন যে, এমন কি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দের ধারা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করাই ভাল; এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন অন্তত দু-বার করে আসনে বসে নির্দিষ্ট-সংখ্যক জপ করবেন আর এক একবারে হাজারের যেন কম না হয়—তার বেশি যত পারেন ততই ভাল। সংখ্যা 'করে'ও রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়। (ইহা বলিয়া তিনি কিভাবে 'করে' জপ করিতে হয় তা ভক্তটিকে দেখাইয়া দিলেন)।

ঠাকুর বলতেন—'নাম নামী অভেদ।' ইষ্টমন্ত্র-জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তিও চিন্তা করবেন—এইভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পারে। ভগবান অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে একবারও যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায় তাতে উড়ো উড়ো মন নিয়ে লক্ষ জপের চাইতেও বেশি ফল হবে। Intensity (তীব্রতা) চাই, ব্যাকুলতা চাই, আর চাই আন্তরিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হয়ে যাবে। এসব একদিনে হয় না—রোক করে লেগে পড়ে থাকুন, ক্রমে সব হবে। আর মাঝে মাঝে মঠে আসবেন। এখানে অনেক সাধু

আছেন—সাধুসঙ্গ করবেন। সাধুদের দর্শন করলেও প্রাণে ভগবৎভাবের উদ্দীপন হয়। সাধন-ভজন করতে করতে মনে কোন সন্দেহের উদয় হলে আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ঠাকুর তো সেই জন্যই আমাদের এখানে রেখেছেন। তবে কি জানেন—sincerity (আন্তরিকতা) থাকলে বেশি সন্দেহ আসে না—আর এলেও তিনি ভিতর থেকেই সব জানিয়ে দেন। সরলতা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতা—এই হলো ধর্মজীবনের প্রধান ভিত্তি। পড়েছেন তো, রত্নাকর দস্যু 'মরা মরা' জপ করে সিদ্ধ হয়ে গেলেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস—বালকের মতো বিশ্বাস চাই। যত সন্দেহ কেবল বাইরে; কিন্তু মন যখন অন্তর্মুখ হয়, ক্রমে অন্তরতম প্রদেশে চলে যায়, তখন খালি আনন্দ। ভগবৎপ্রেমে হৃদয় ভরে যায়। অবশ্য সব সন্দেহের নিরাস ভগবদ্দর্শন না হলে হয় না।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।'[১]

## বেলুড় মঠ

কার্তিক, ১৩২৯ (নভেম্বর, ১৯২২)

১৩২৯ সালের কার্তিক মাস। দেশময় অসহযোগ আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক জেলে যাইতেছে। সমগ্র ভারত যেন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী মাতৃভূমির স্বাধীনতা-অর্জনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া দেশমাতৃকার বেদিমূলে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।

সোমবার, সন্ধ্যাকাল। সবেমাত্র ঠাকুরঘরে আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূর হইতে মনে হয় যেন মঠ জনমানব-শূন্য। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকলেই জপধ্যানে রত।

মহাপুরুষ মহারাজও নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন, ধ্যানমগ্ন। ক্ষীণ দীপালোকে তাঁহার শান্ত মুখমণ্ডল আরও প্রশান্ত ও প্রদীপ্ত দেখাইতেছে। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। মহাপুরুষজী এইবার আস্তে আস্তে শিব-মহিম্নঃস্তোত্র সুর করিয়া গাহিতেছেন। তাঁহার মন তখনও যেন লীন হইয়া আছে আনন্দসাগরে। এমন সময় জনৈক কলিকাতানিবাসী ভক্ত ঠাকুরঘর হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মেজেতে উপবেশন করিলেন। ভক্তটি পরিচিত এবং মঠের সহিত

---

১ সেই কার্য ও কারণরূপী ব্রহ্ম দর্শন করিলে দ্রষ্টার হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কিছু পরে মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে, কা—? কখন এলে?

ভক্তটি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—হাঁ মহারাজ, এই সন্ধ্যারতির সময় এসেছি।

—এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা, তোমাকে অমন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন বল তো? বাড়ির সব কুশল তো?

—আপনাদের আশীর্বাদে বাড়ির সব কুশল, মহারাজ, কিন্তু আজ কদিন থেকে একটা বিষয় মনের ভিতর বড় তোলপাড় করছে, তাই মনে ভারি অশান্তি। আজ আপনার নিকট সব নিবেদন করব বলেই মঠে এসেছি। আপনি অনুমতি করেন তো বলি।

—বেশ তো, বল না।

ভক্তটি তখন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, এখন সমগ্র দেশ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে মাতোয়ারা। শত শত নরনারী জেলে পচে মরছে। কত লোক প্রাণ দিচ্ছে। মহাত্মাজী নিজেও এ বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু দেশব্যাপী এত বড় ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশন একেবারে চুপ কেন? আপনাদের কি এতে কিছুই করবার নেই? সারা দেশের লোক তো অবাক হয়ে ভাবছে যে রামকৃষ্ণ মিশন করছে কি! দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে তাদের কি কিছু কর্তব্য নেই? শেষটায় অনুযোগের সুরে বললেন—দেশের জন্য আপনাদের প্রাণ কি একটুও কাঁদে না? আপনাদের কি কিছুই করবার শক্তি নেই?

মহাপুরুষজীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল যেন আরও গম্ভীরভাব ধারণ করিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন—দেখ কা—যুগাবতারের কার্য সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য। সমগ্র দেশবাসী বা তোমরাই ভগবানের কার্যের গতি কি করে বুঝবে বল। যখন শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করে আসেন তিনি কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের জন্য আসেন না, তিনি আসেন সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য। ভগবানের মহাসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ এবার। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিগ্রহ। তাঁর ভিতরে ষড়ৈশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও এবার শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব আশ্রয় করেই তিনি নরদেহে ছিলেন। দেখ না, তিনি কিভাবে গঙ্গাতীরে একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন! এসবের যে কি গূঢ় অর্থ তা তোমরা কেমন করে বুঝবে? স্বামীজীর মতো অমন মহাশক্তিশালী আধারকে তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর সেই সাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সহায়করূপে। স্বামীজী কি ইচ্ছা করলে এ দেশে একটা মহা রাজনীতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারতেন না? তাঁর মতো স্বদেশপ্রেমিক আর কে আছে? কজনের প্রাণ তাঁর মতো কেঁদেছিল গরিবদুঃখীদের জন্য? কিন্তু তিনি তো তা করেননি। ভারতের যদি বাস্তব

কল্যাণ তাতে কিছু হতো তবে তিনি অবশ্যই তা করতেন। আর স্বামীজীর কথা ছেড়ে দাও, আমাদের ভিতরই প্রভুর কৃপায় এমন শক্তি রয়েছে যে আমরাও ইচ্ছা করলে দেশটাকে তোলপাড় করে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর তো আমাদের তা করতে দেবেন না। তিনি আমাদের এনেছেন তাঁরই কাজের সহায়করূপে এবং আমাদের হাত ধরে দেশের ও দশের যাতে বাস্তব কল্যাণ হয় তাই করিয়ে নিচ্ছেন। আর আমরা করেও যাচ্ছি তাই। জগতের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আমাদের তো আর কোন কামনা নেই! জগতের দুঃখকষ্টে আমাদের প্রাণ যে কতটা কাঁদে তা তো তোমাকে বলে বোঝাবার নয়! সে জানেন একমাত্র অন্তর্যামী। ঠাকুর নরলীলা-সংবরণের পর তাঁর সমগ্র শক্তি ও কার্যভার অর্পণ করেছিলেন স্বামীজীর উপর। স্বামীজীও সারা দুনিয়াটা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে তন্ন তন্ন করে দেখে ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সমগ্র জগতের, বিশেষত ভারতের কল্যাণকর কাজ করবার জন্যই এই মঠ-মিশন স্থাপন করলেন, এবং আমাদের সকলকেও একে একে এই সব কাজে লাগালেন। আমরা কি আর পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতুম না? করছিলুমও তো তাই। আমাদের প্রায় সকলেই তো সাধন-ভজনের জন্য যার যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্বামীজীই ক্রমে ক্রমে সকলকে ডেকে এনে এইসব কাজে লাগালেন—সেই নারায়ণবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কাজে। এখনো এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমরা তাই করে যাচ্ছি।

ভক্ত—তবে কি মহারাজ, আপনার মতে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি দেশনায়কগণ ঠিক ঠিক দেশের কাজ করছেন না? তাঁদের অপূর্ব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দেশসেবা তো উপেক্ষার কথা নয়। তাঁরা কত নির্যাতন, কত অত্যাচারই না সহ্য করেছেন দেশের জন্য!

মহারাজ—তা কেন বলব? তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, দেশসেবা ইত্যাদি বাস্তবিকই খুব প্রশংসনীয়। তাঁদের জীবনও বাস্তবিকই মহান ও আদর্শস্থানীয়। তাঁরা দেশের যথেষ্ট কাজও করেছেন। তবে আমাদের কাজের ধারা অন্য রকম। তাঁরা যা ভাল বুঝছেন, দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ মনে করছেন, তাই sincerely (আন্তরিকভাবে) করে যাচ্ছেন। আমাদের ধারণা কি জান? ঠাকুর এবং স্বামীজীর এক একটি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এইসব কাজ করছেন। আর মহাত্মা গান্ধী যে বাস্তবিকই মহাশক্তিমান পুরুষ তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সেই আদ্যাশক্তি জগন্মাতার একটা বিশেষ শক্তির বিকাশ যে তাঁর মধ্যে হয়েছে তাও ঠিক। গীতাতে শ্রীভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্॥' ইত্যাদি—যেখানেই বিশেষ শক্তির প্রকাশ, যাঁকে বহু লোকে মানে গণে, সেখানেই ভগবৎশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়েছে, এ ধ্রুব সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগতের কল্যাণের জন্য জগন্মাতার যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই শক্তিই আধারবিশেষকে অবলম্বন করে নানাভাবে কাজ করছে। স্বামীজী বহু স্থানে ভারতের কিভাবে বাস্তব কল্যাণ হবে তা বলে গেছেন। আজ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর

পূর্বে দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন—এই ছুঁৎমার্গ পরিহার, অনুন্নত জাতিদের উন্নয়ন, দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইত্যাদি ইত্যাদি—সেইসব ভাবই তো মহাত্মা গান্ধী এখন প্রচার করছেন। এতে দেশের বাস্তব কল্যাণ হবে নিশ্চয়। আমরা তো ঐসব কাগজে-পত্রে বেশি বলা-কওয়া করি নে, কিন্তু হাতেনাতে করে দেখাচ্ছি, তবে রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে নয়; আর মহাত্মাজী রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে ঐসব কাজ করছেন। আমরা ভারতের যেমন কল্যাণ চাই, অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতিরও তেমনি যথার্থ মঙ্গল চাই। ভারতের কল্যাণের জন্য আমরা এদেশে যেমন কাজ করছি, অন্যান্য দেশের কল্যাণের জন্য ঐসকল দেশেও তেমনি কাজ করছি। তবে দেশকাল-পাত্রাদি-ভেদে আমাদের কাজের ধারা বিভিন্ন। স্বামীজী এই যে মঠ-মিশন স্থাপন করে গেছেন, এর প্রত্যেক ত্যাগী সন্তানই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (আপনার মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য) কাজ করে যাচ্ছে, ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী।

ভক্ত—কিন্তু মহারাজ, মহাত্মাজী এই অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র দেশে যে জাগরণের সৃষ্টি করেছেন সে সঙ্গে যদি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহযোগিতা থাকত তো দেশের কাজ ঢের এগিয়ে যেত। এ কেবল আমার মত নয়, দেশের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও ধারণা তাই। আপনারা মহাত্মাজীর সঙ্গে একযোগে কাজ করেন না কেন?

মহারাজ—দেখ, আমি তো পূর্বেই তোমাকে বলেছি যে আমরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আর ঐ আদর্শ রেখে গেছেন সেই দূরদর্শী ঋষি স্বামীজী নিজে। খালি ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সহস্র বৎসরের ভবিষ্যৎ ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর দিব্য দৃষ্টির সামনে, এবং তিনি সব স্পষ্ট দেখে, জেনে শুনে তবে একটা ধারা নির্ণয় করে গেছেন। তাঁর তো আর অন্ধকারে ঢিল ছোড়া নয়! তিনি সুদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য সব পরিষ্কার দেখতে পেতেন। আর এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তেমনটি শত শত বৎসরের মধ্যে আর হয় নি। এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ দীর্ঘকাল অবাধে সমগ্র জগতে চলবে। এই তো সবে সূচনা, সবে আরম্ভ। যে আধ্যাত্মিক সূর্য ভারতগগনে উদিত হয়েছে তার বিমল কিরণে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হবে। তাই তো স্বামীজী বলেছেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' ভারতকে কেন্দ্র করেই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হবে। ঐ ঐশী শক্তির গতি রোধ করে কার সাধ্য। ভারতের জাগরণ অতি নিশ্চিত। শিক্ষা, দীক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি—সব বিষয়ে ভারতের এত উন্নতি হবে যে সমগ্র জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। ভারতের ভবিষ্যৎ এত মহিমান্বিত যে তা অতীতের গৌরবকে ম্লান করে দেবে। তখন বুঝবে যে ঠাকুর-স্বামীজী কেন এসেছিলেন, এবং ভারতের জন্য তাঁরা কি করে গেছেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাঁদের কার্যকলাপ কি বুঝবে? তাঁরা যে ভারতের জাতীয় কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, তাও কি দেখতে পাচ্ছ না?

## বেলুড় মঠ
### বৈশাখ, ১৩৩০ (মে, ১৯২৩)

আজ সিন্ধুদেশবাসী জনৈক ভক্তের দীক্ষা হইয়াছে। ভক্তটি ইতঃপূর্বে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মর্ম কিছু বুঝিতে না পারায় ঐ মন্ত্র পাওয়া অবধি তাঁহার মন খুবই অস্থির হইয়া পড়ে। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠির দ্বারা তাঁহার মনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুমতি পাইয়া ভক্তটি সুদূর সিন্ধুদেশ হইতে প্রাণের আবেগে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুইয়া নববস্ত্র পরিধানপূর্বক বেলা প্রায় দশটার সময় মহাপুরুষজী ঠাকুরঘরে গমন করিলেন এবং যথাবিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সমাপনানন্তর সেই সিন্ধী ভক্তটিকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাদি শেষ করিয়া ছাদের উপর দিয়া ঠাকুরঘর হইতে নিজ প্রকোষ্ঠে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডলে এক দিব্য আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যথারীতি চেয়ারে উপবেশন না করিয়া ভাবাবেশে টলিতে টলিতে হাততালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন—

> 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
> তব্ কোয়লা কী ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥'

সে যে কী তন্ময়তা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু, মন যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে! আর তিনি তদ্গতচিত্তে সারা ঘরময় পায়চারি করিয়া ঐ দু-লাইন মাত্র গাহিতেছেন। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ—যেন জোর করিয়া কখনও একটু চোখ মেলিয়া পশ্চিম দেয়ালে স্থাপিত ঠাকুরের বড় ছবিখানির দিকে এক একবার একটু তাকাইতেছেন। বাহ্য-জগতের কোনই হুঁশ নাই। তাঁহার স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর হৃদয়ের গভীর প্রেমে সিক্ত হইয়া আরও মিষ্ট শুনাইতেছিল। যেন সুধা বর্ষণ করিতেছে। অনেকক্ষণ ঐভাবে কাটিয়া গেল। শেষটায় এলোথেলোভাবে চেয়ারে উপবেশনানন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে 'জয় প্রভু! দীনশরণ! করুণাময় প্রভু! জয় মা!' উচ্চারণ করিতেছেন।

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন; এখন ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া করজোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন—আপনার দয়ায় আজ আমি প্রাণে শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নেও আপনিই আমায় কৃপা করেছিলেন।

মহাপুরুষজী—বাবা, ঠাকুর তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন বলেই স্বপ্নে কৃপা করেছিলেন। আবার আজও ঠাকুরই অন্যরূপে তোমায় কৃপা করেছেন। তিনি কৃপাময়—অহেতুক কৃপাসিন্ধু। জীবোদ্ধারের জন্যই এ যুগে নরদেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রিত দাস মাত্র। কৃপা করবার মালিক তিনি। স্বয়ং ভগবানই কৃপা করতে পারেন—আমি তো এই জানি। শাস্ত্রেও আছে যে, যখন সদগুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন তখন স্বয়ং ভগবানই সেই গুরুর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। ভগবানই একমাত্র গুরু। মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না। তোমার পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে পতিতপাবন পরমদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেলে। আজ আমি তোমাকে তাঁর চরণে সঁপে দিয়েছি—তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছি। আজ হতে ঠাকুর তোমার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন।

ভক্ত—আমি তো, মহারাজ, ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি নে। আমি জানি যে, আপনিই কৃপা করেছেন।

মহাপুরুষজী—তা তুমি ভাবতে পার; কিন্তু আমি জানি যে, ঠাকুরই তোমায় কৃপা করেছেন। আজ হতে তুমি তাঁর হয়ে গেলে। এখন হতে ঠাকুরকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। অন্তরে বাইরে তাঁকে দেখবার চেষ্টা কর। তাঁকে খুব আপনার মনে করবে। এ সংসার তো দু-দিনের। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন—এসব সম্বন্ধই মায়িক, দু-দিনকার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের যে শাশ্বত সম্বন্ধ! দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। আজ যে অমোঘ বীজ তোমার হৃদয়ে বপন করা হলো, তা প্রেমভক্তিরূপ বারিসিঞ্চনে দিন দিন বর্ধিত হয়ে ক্রমে মহা অমৃতবৃক্ষে পরিণত হবে এবং তোমার জীবনে চতুর্বর্গফল দান করে তোমার সমগ্র জীবন মধুময় করে দেবে, তুমি পূর্ণকাম হয়ে যাবে।

ভক্ত—আমি তো মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব। নানা বন্ধনের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। সংসার-বিপাকে ডুবে গিয়ে যাতে আপনার শ্রীচরণ ভুলে না যাই, এই আশীর্বাদ করুন। সংসারে কিভাবে থাকতে হবে—যাতে একেবারে ডুবে না যাই সে বিষয়ে একটু উপদেশ দিন। এ অধমকে যে করেই হোক ত্রাণ করতে হবেই।

ইহা বলিয়া ভক্তটি সাশ্রুনয়নে মহাপুরুষজীর চরণযুগল ধারণ করিলেন। ভক্তটির ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে স্নেহভরে তিনি বলিলেন—বাবা, তোমাকে তো বলেছি যে আজ তোমায় ঠাকুরের চরণে সঁপে দিয়েছি, আর তিনি তোমায় গ্রহণ করেছেন ও তোমার সব ভার নিয়েছেন তোমাকে গ্রহণ করবেন বলেই তো, তোমার প্রাণে দিব্য প্রেরণা দিয়ে এখানে এনেছেন। আজ তোমার নবজীবন লাভ হলো। ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরা যা বলছি তাও সত্য। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তোমার সমস্ত ভার তাঁর উপর সঁপে দিয়ে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে ডেকে যাও। ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না। তিনি সর্বাবস্থায়

তোমায় দেখবেন। আর সংসারে কিভাবে থাকতে হবে তা যে জিজ্ঞাসা করছ, সে তো ঠাকুরের কথাতেই আছে। সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড় মানুষের বাড়ির দাসী—সব কাজ কচ্ছে কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে ও নিজের বাড়ির দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে; কিন্তু প্রাণে-প্রাণে জানবে যে, তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান। তিনি ছাড়া তোমার আর আপনার কেউ নেই। তা বলে স্ত্রী-পুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবদ্-প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করবে এবং তাদের মনও যাতে ভগবন্মুখী হয় তার চেষ্টা করবে। সংসারে থাকবে কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবানলাভ হয় না। অতএব টাকা কখনো জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশি worldly ambition (সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা) মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো করে নিয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কাম-কাঞ্চন ও মান-যশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে সব চাইতে বড় ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) হলো ভগবানলাভ। সেই ambition-ই মনে সর্বক্ষণ রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পার তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

এমন সময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িতেই মহাপুরুষজী ভক্তটিকে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতে বলিলেন। খানিক পরে জনৈক সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ মহাপুরুষজীর জন্য লইয়া আসিল। সেইদিন তিনি খাইবার আসনে বসিলেন কিন্তু দীক্ষা দিয়া ঠাকুরঘর হইতে আসিবার পর হইতেই তাঁহার খুব অন্তর্মুখভাব—কেমন একটা নেশার ঘোর যেন লাগিয়াই আছে। চক্ষু প্রায় নিমীলিত; আহারের দিকে আদৌ মন নাই—অভ্যাসবশত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সামান্য খাইতেছেন মাত্র। একটু কথাবার্তা বলিলে হয়তো তাঁহার মন আহারের দিকে আসিতে পারে এই ভাবিয়া সেবক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটু প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—মহারাজ, আজ দীক্ষা দিতে ঠাকুরঘরে বেশ অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল। মহাপুরুষজী যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটু চমকিত হইয়া বলিলেন—হাঁ। আহা, লোকটি খুবই ভক্তিমান! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে; তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দিবার সময় তা বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভাল তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে—সর্বাঙ্গে পুলক, অশ্রু, কম্পন এইসব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনামাত্রই সর্বাঙ্গে

কম্পন ও একটু পরেই পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কি প্রেমাশ্রু! দু-চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়ামাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কত ভাবে কত লোককে কৃপা করছেন! দেশবিদেশে কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই! ধন্য প্রভু!

সেবক—দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো মহারাজ, এতটা উদ্দীপন হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?

মহাপুরুষজী—তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরিতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরি করে নিতে পারেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ, বিশেষ করে সেই সিদ্ধমন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞ গুরুর ভিতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন, 'সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসারবন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।'

## বেলুড় মঠ

১৯ শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩০ (৪ অগস্ট, ১৯২৩)

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। ভাবপ্রদীপ্ত মুখ, চক্ষু হইতে করুণাধারা বর্ষিত হইতেছে। ঘরে অগাধ শান্তি বিরাজিত। শনিবার বলিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকজন ভক্ত মঠে আসিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই যুবক, আফিসে কাজ করেন। ছুটি পাইলেই মহাপুরুষ মহারাজের চরণসান্নিধ্যে উপনীত হন ও তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আজ সাধন-ভজনের কথা উঠিল। একজন প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, কোন কোন দিন জপ-ধ্যান করতে বেশ ভাল লাগে; আবার অন্যদিন সে রকম আনন্দ পাই না। এরূপ কেন হয়?

মহারাজ—হাঁ, এমন হয় বটে, কিছুদিন বেশ ভাল লাগে, আবার সময় সময় ভাল লাগে না। তা হয়, প্রথম অবস্থায় প্রায় সকলেরই ওরূপ হয়। কিন্তু তা বলে তখন জপ-ধ্যান বন্ধ করতে নেই। ঠাকুর খানদানী চাষার কথা বলতেন না? তেমনিভাবে লেগে থাকতে হবে, আর তখন খুব প্রার্থনা করবে। বলবে, 'প্রভু, আমরা সাধনহীন, ভজনহীন,

সংসারে রয়েছি; আমরা দুর্বল, আমাদের তেমন সময়, শক্তি কিছুই নেই, তুমি কৃপা করে মন ঠিক করে দাও—যেন তোমাকে ভালভাবে ডাকতে পারি। তুমি ভিন্ন আমাদের কেউ নেই। আমরা অতি দুর্বল। তুমি যদি শক্তি না দাও তবে কি করে তোমায় ডাকব?' এইভাবে খুব প্রার্থনা করবে, বাবা। প্রার্থনা, প্রার্থনা, তাঁর কাছে কেবল কাতরভাবে প্রার্থনা কর। তাঁকে ডাকতে ডাকতে কাঁদ; তবে তো তাঁর দয়া হবে। দেখ না, শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন করে মাকে ডাকতেন! 'একটা দিন চলে গেল, মা এখনও দেখা দিলি নি' বলে মাটিতে মুখ ঘষড়ে কাঁদতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও কত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতেন—'প্রভু, তোমার নামে রুচি হলো না' বলে দূর্বাতে মুখ ঘষতেন আর কাঁদতেন। এমনি করে ব্যাকুলভাবে তাঁর নাম করতে হয়। নামই সার বাবা, নামই সার। তাঁর নাম করতে করতে হৃদয়ে শক্তি আসে। সর্বদাই তাঁর নাম ও প্রার্থনা করতে ভুলো না।

ভক্ত—মহারাজ, তাঁর নাম কি সব সময়েই করতে পারা যায়? যেমন চলতে চলতে?

মহারাজ—নিশ্চয়ই। জপের কোন কালাকাল নেই, যখনই সময় পাবে তখনই তাঁর নাম করবে। চলতে ফিরতেও তাঁর নাম মনে মনে স্মরণ করবে। তখন 'করে' জপ বা মালা জপ সম্ভব নয়, কারণ তা হলে যে লোকে দেখতে পাবে। ভগবানের নাম খুব গোপনে করতে হয়, যেন লোকে টেরও না পায়। আর তাঁর স্মরণ-মনন করবে সর্বক্ষণ। একটা অভ্যাস জমিয়ে নিতে হয়। চলতে ফিরতে, খেতে শুতে, এমন কি সব কাজকর্মের মধ্যেও নিরন্তর তাঁর স্মরণ-মনন করবে—যেন একটা undercurrent (অন্তঃস্রোত) চলছে। এইভাবে কিছু দিন অভ্যাস করলে দেখবে যে তোমার অজ্ঞাতসারে, এমন কি ঘুমের ভিতরও জপ চলেছে—স্মরণ-মনন ভিতরে ভিতরে চলেছে।

ভক্ত—মন কিন্তু কিছুতেই স্থির হতে চায় না। হয়তো জপ করছি—হাতে মালা রয়েছে, মুখে নাম উচ্চারণও হচ্ছে, কিন্তু মনে তখন নানা রকম চিন্তা। এমন চিন্তাও আসে যা কখনো জীবনে ভাবি নি।

মহারাজ—হাঁ, এই মন বেটাই যত গোল করে। এই মনটাকে বশে আনতে হয়, নতুবা এদিক-ওদিক নিয়ে বেড়ায়। তবে কি জান, আন্তরিক চেষ্টা থাকলে এই মনই আবার বশে আসে—এই দুষ্ট মনই পরে ঠিক হয়ে গিয়ে গুরুর কাজ করে, অন্তরে অন্তরে তাঁর নাম করে, মানুষকে সৎপথে চালিত করে, সৎকর্মে প্রেরণা দেয়। বারংবার অভ্যাস করতে হয়, আর ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, সদসৎ বিচার করতে হয়। এ তো বাবা, এক দিনের কর্ম নয়। তাই তো গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—

'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥'

—'হে বীর, এই চঞ্চল মনকে নিরোধ করা যে অতি কঠিন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে।' অভ্যাস, নিরন্তর অভ্যাস, আর বিচার চাই। একমাত্র ভগবানই সৎ বস্তু, নিত্য বস্তু—এইটে প্রাণে বিশেষ করে ধারণা করতে হবে।

কথা বলিতে বলিতে মহারাজের মন ক্রমশই অন্তর্মুখ হইতেছে। তিনি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কেহ ঠাকুরঘরে, কেহ বা গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন।

## বেলুড় মঠ

২৯ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩০ (১৪ অগস্ট, ১৯২৩)

প্রাতঃকাল, বেলা প্রায় সাড়ে-সাতটা। মহাপুরুষ মহারাজ সবেমাত্র ঠাকুরঘর হইতে আসিয়াছেন। আজকাল তিনি সকালের দিকে অনেকক্ষণ বসিয়া ধ্যান করেন। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতির সময়েই তিনি একখানি মৃগচর্মের আসন লইয়া ঠাকুরঘরে যান এবং ধ্যানে বসেন। তথা হইতে আসিতে কোন কোন দিন অনেক বেলা হইয়া যায়। আজ ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া নিজ ঘরে চেয়ারে বসিয়াছেন, এখনও ধ্যানের নেশা যেন কাটে নাই, খুব তন্ময় ভাব। মঠের সাধু ব্রহ্মচারী ও বাহিরের ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষজী খুব সংক্ষেপে দু-এক কথায় কুশলপ্রশ্নাদি করিতেছেন, এখনও কথাবার্তা বলিবার মতো মনের অবস্থা নয়। গতকল্য মঠের একজন সন্ন্যাসী ঁরামেশ্বর ও দ্বারকাদি তীর্থ পর্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই সাধুটি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিতেই মহাপুরুষজী "জয় বাবা রামেশ্বর, জয় দ্বারকানাথজী" বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিলেন এবং সেই সাধুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—এসব বিষয় ধ্যান করবে, যা দর্শন করে এলে ওসব ধ্যানে আনবার চেষ্টা করবে। তীর্থাদি দর্শন করবার এই তো উদ্দেশ্য। দেশ-ভ্রমণের মতো তীর্থাদি ঘুরে এলে তাতে কিছুই হয় না। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা এসব বিষয় ধ্যান করে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করে। তিনিই তো সব হয়েছেন, তীর্থাদি তাঁরই ঐশ্বর্য, তাঁর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্যেরও চিন্তা করতে হয়। তীর্থাদিতে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। তিনি তো আর আমাদের ঠাকুরঘরেই বসে নেই; তিনি জগন্নাথ, সর্বব্যাপী, সর্বত্রই রয়েছেন। তবে তীর্থাদিতে এবং সাধুভক্তদের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।

সন্ন্যাসী—এবার কিছুকাল ঘুরে এসে এ ধারণাটা খুবই বদ্ধমূল হয়েছে যে তীর্থাদিতে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। আর তিনি যে হাত ধরে পদে পদে আমাদের রক্ষা করছেন তাও

ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি। কন্যাকুমারীতে তিন দিন ছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠাদিতেই অনেক সময় কেটে যেত। স্থানটিও এত মনোরম যে ছেড়ে আসতে প্রাণ আর সরে না। ঠাকুরের কৃপায় থাকবার বন্দোবস্তও ভালই হয়েছিল—সে এক অভাবনীয় উপায়ে।

মহারাজ—মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয় নিঃসম্বল অবস্থায়। তবেই তাঁর উপর ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসে। আর ছাই হবে শ্রীভগবানের উপর ঠিক ঠিক নির্ভরতা না এলে! এত সাধন-ভজন যা করতে হচ্ছে সবই তো সেই নির্ভরতা আনবার জন্য। আর অনন্যমনে যে তাঁর শরণাগত হয় তার সমস্ত ভার তিনি নেন, তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। তাই তো গীতাতে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।'

—'যাহারা আমার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া আমার চিন্তা ও উপাসনা করে, সর্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত সেই-সকল ব্যক্তির যোগ এবং ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমিই বিধান করিয়া থাকি।' যে অনন্যকাম হয়ে তাঁর ভজনা করে, তাঁর শরণাগত হয়, সে ভক্তের সমস্ত ভার তিনিই গ্রহণ করেন।

ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাস-জীবনের কথা উঠিল। জনৈক নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, সন্ন্যাস-জীবনে কি কি নিয়ম পালন করে চলতে হবে? পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসীর পক্ষে যেসব নিয়মের বিধি আছে সে-সব তো আমাদের এই কাজকর্মের ভিতর অনেক সময় মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সুধীর মহারাজের (স্বামী শুদ্ধানন্দের) সঙ্গেও কাল রাত্রে ঐ সব কথাবার্তা হয়েছিল।

মহারাজ—হাঁ, সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সেসব নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না। ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা হলে কর্মযোগী সন্ন্যাসী। তোমাদের জন্য স্বামীজী নতুন আদর্শ রেখে গেছেন। তোমাদের সাধন-ভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধন-ভজনের অনুকূল কর্ম। কাজেই তোমাদের পক্ষে ঐসব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সে সব নিয়ম হলো কেবল জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদের জন্য—যাঁরা কোন কাজকর্ম করেন না, কেবল জ্ঞানানুশীলন, জ্ঞান-বিচার করেন, তাঁদের জন্য। তবে কি জানলে বাবা, মূল জিনিস কটা ঠিক রাখতে পারলে আর সব ক্রমে ঠিক হয়ে যায়।

সন্ন্যাসী—মূল জিনিস কি, মহারাজ?

মহারাজ—মূল জিনিস হলো কাম-কাঞ্চনত্যাগ। ঠিক ঠিক কাম-কাঞ্চনত্যাগী হতে পারলেই হলো। খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয়, কাম-কাঞ্চনাসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। ঐ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি, ঐ সমস্ত এষণার মূলেই হলো কাম

ও কাঞ্চন এই দুটো জিনিস। কাম-কাঞ্চনত্যাগ সর্বতোভাবে—এই হলো সন্ন্যাসীর একমাত্র বিশেষ করে মানবার জিনিস। ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁর কাছে। তিনি তো ভগবান, তিনিই কৃপা করে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসী—কিন্তু মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে কিছু কিছু এষণা তো রাখতেই হবে?

মহারাজ—হাঁ, সে ঠিক। তা শাস্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেই রয়েছে, 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'—'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন।' শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে। ভিক্ষাদিও প্রয়োজন মতো অতি সামান্য করবে। কিন্তু চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় খেতে হবে বা আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই। আর শরীর ধারণের উদ্দেশ্যও হবে তাঁকে প্রাণভরে ডাকা এবং তাঁর সেবাদি কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।

সন্ন্যাসী—আচ্ছা মহারাজ, দ্বৈতবাদীদের পক্ষে সন্ন্যাস কেমন করে সম্ভব?

মহারাজ—তা কেন হবে না? সন্ন্যাসের সার অর্থই হলো এষণাত্রয়ের সম্যকরূপে নাশ। ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী তো অন্য সমস্ত এষণা ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানকেই চায়, আর কিছুই চায় না। ভগবানই তো একমাত্র কাম্য বস্তু। তাঁকে পাবার যে কামনা, সে কামনার মধ্যেই নয়।

## বেলুড় মঠ

২২ ভাদ্র, শনিবার পূর্বাহ্ণ, ১৩৩০ (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

সকালবেলা। মহাপুরুষ মহারাজ সবেমাত্র ঠাকুরঘর হইতে ফিরিয়াছেন। এখনও আপনভাবে তন্ময়। গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন। মৃগচর্মের আসনখানি বগলে করিয়া ছাদের উপর দিয়া ঠাকুরঘর হইতে আসিবার সময় দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং পরে গঙ্গা প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে আসিলেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ধ্যানজপাদি সমাপনান্তে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি কাহারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা এখনও কহিতেছেন না—আপন ভাবে চুপচাপ বসিয়া আছেন। কিছু পরে জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী আসিয়া মহাপুরুষজীকে প্রণামানন্তর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সন্ন্যাসী মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করেন।

মহাপুরুষজীর সঙ্গে মঠের কাজকর্ম-বিষয়ে সামান্য আলাপের পর দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে কথার অবতারণা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, মহারাজ, এই যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদি সব রিসিভারের হাতে গেল, এতে ভাল হবে কি?

মহাপুরুষজী—মনে হচ্ছে তো ভালই হবে। ইদানীং মায়ের সেবা পূজাদির বড়ই বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল। তাই বোধ হয় মায়ের ইচ্ছাতেই এ ব্যবস্থা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর কি কম স্থান গা? স্বয়ং ভগবান জীব-কল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করে গেছেন। আর এমন অভিনব সাধনা জগতের ইতিহাসে পূর্বে কখনো হয় নি—ভবিষ্যতেও বোধ হয় হবে না। দক্ষিণেশ্বরে সকল তীর্থের সমাবেশ হয়েছে; ও-স্থানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, আবার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব ধর্মের, সকল মতের সাধকদের কাছেই ঐ স্থান মহাতীর্থ। জগতে যেসব তীর্থস্থান আছে তাতে কোথাও হয় তো একজন সাধক কোন ভাবে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে গেছেন, কোথাও বা কোন সিদ্ধপুরুষ দেহত্যাগ করেছেন—এই রকম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর স্বয়ং ভগবানের সাধন-পীঠ। ও-স্থানে কত রকম আধ্যাত্মিক ভাবের যে বিকাশ হয়েছে তার ইতি কে করে? কালে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য লোকে বুঝবে, তখন ওখানকার ধূলিকণা নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে। ঐ স্থানের ঘনীভূত আধ্যাত্মিক আবহাওয়া নষ্ট হবার নয়। যখন থেকে শুনেছি যে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সেবাপূজা ও ভোগাদি ঠিক ঠিক হচ্ছে না, তখন থেকেই আমি রোজ মাকে আহ্বান করে মনে মনে তাঁর পূজা ও ভোগাদি এখানেই নিবেদন করছি। মাকে বলি—'মা, তুমি খাওয়া-দাওয়া এখানেই কর। আমাদেরই সেবা গ্রহণ কর।' ওখানকার মন্দিরের সেবা-পূজাদির সব সুব্যবস্থা হয়ে যায় তো নিশ্চিন্ত হই।

স্বামীজী বলেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের সব জায়গাই হয়তো কালে মঠের অধীনে আসবে। মথুরবাবু তো প্রাণ থেকে ঠাকুরকে সবই দান করেছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তখন উহা গ্রহণ করেন নি। এখন তাঁর কাজ কত দিকে কত ভাবে হচ্ছে—বিশেষ করে ঐ স্থানটি রক্ষা করার দরকার হয়ে পড়েছে। মায়ের ইচ্ছা হলে সবই হয়তো মঠের অধীনে আসবে।

সন্ন্যাসী—কিন্তু মহারাজ, এসব টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করা বড় মুশকিল ব্যাপার। তা ছাড়া আবার জমিদারী আছে—ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ। বৈষয়িক ব্যাপার এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে জড়িত হবার দরুন ক্রমে আদর্শচ্যুত হয়ে বড় বড় ধর্মসম্প্রদায়ের পতন হয়ে গেছে—ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাপুরুষজী—তুমি যা বলছ তা একদিক থেকে ঠিকই। তবে আমার মনে হয় কি জান? যে-সব ধর্মসঙ্ঘের পতন হয়েছে তার মূল কারণ ছিল সাধন-ভজন ও ত্যাগ-তপস্যাদির অভাব। ঠাকুরের এ সঙ্ঘেও যতদিন ত্যাগ-বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল থাকবে, সঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গ যতদিন ভগবানলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জেনে ভজন-সাধন ও

তপস্যাদিতে রত থাকবে, ততদিন কোনই ভয় নেই—সব ঠিক চলবে। সাধুর ঠিক ঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাজ অতি সুন্দর একটি কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, সন্ন্যাসী যখন অট্টালিকায় বাস করবে তখনো ভাববে, 'আমি গাছতলায় রয়েছি'; আর যখন চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় খাবে তখনো মনে মনে ভাববে, 'আমি পবিত্র ভিক্ষান্ন খাচ্ছি।' তার মানে এই যে, সাধু সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত থেকে অন্তরে তপস্যার ভাব জাগিয়ে রাখবে। ভাব শুদ্ধ থাকলে আর কোন ভয় নেই। ভাব নিয়েই সব।

তা ছাড়া তোমরা যে-সব কাজকর্ম করছ, সে-সবই তো শ্রীভগবানের কাজ —তোমাদের নিজের জন্য তো আর কেউ কিছু করছ না? কাজ তো তোমাদের সাধনের অঙ্গ। তাঁরই সেবাজ্ঞানে তাঁর কাজ করলে তাতে চিত্তের মালিন্য সব কেটে যাবে নিশ্চয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ভজন-সাধন জোর চালাতে হবে। সাধন-ভজনে মন্দা পড়ে গেলে সবই গোলমাল। অনাসক্ত হয়ে তাঁর কাজ করতে হবে। এটি সর্বদা মনে রেখো যে কেউ যদি আন্তরিক 'ঠাকুরের কাজ করছি' এই বুদ্ধিতে তাঁর কাজ করে যায়, তার কখনো কোন অকল্যাণ হবে না, তিনি তাকে সতত রক্ষা করবেন। কিন্তু অহংকার অভিমান এলেই মারা যাবে। ঠাকুর বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে। তাঁর কাজ করে, তাঁর সেবা করে ধন্য হয়ে যাচ্ছি—এই ভাব আশ্রয় করে থাকলে কোন ভয় নেই। আর নিজের মনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতি কাজে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করা চাই। যখনই লক্ষ্য করবে যে, মনের গতি এতটুকুও বদলেছে, তখনই তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাবে, আর ভজন-সাধনে আরো জোর দেবে। কাজ তো দিবারাত্রি সর্বক্ষণ করবে না? আর কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক চালাতে হবে তাঁর স্মরণ-মনন।

সন্ন্যাসী—জীবন্ত আদর্শ সামনে দেখতে না পেলে সব সময় জীবনের গতি আদর্শের দিকে নিয়ন্ত্রিত করা বড় মুশকিল। এই আপনারা যতদিন আছেন ততদিন সবই ঠিক চলবে, তারপর যে কি হবে তা ঠাকুরই জানেন।

মহাপুরুষজী—তা কেন? এইটে ঠিক জানবে যে, ঠাকুরই হলেন জীবন্ত আদর্শ। আর আমরাও তো আছিই। দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো আর সব শেষ হয়ে যায় না? সাধন-ভজনের দ্বারা মন সংস্কৃত হলে তখন সে মনে ভগবানের দিব্য অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিই হলো আসল অনুভূতি এবং তার প্রভাব সমগ্র জীবনব্যাপী থাকে। তা ছাড়া তোমরাও কি কম? চোখের সামনে ঠাকুরের সন্তানদের আদর্শ-জীবন দেখতে পেলে, তাঁদের সঙ্গলাভ করলে—এও বহু সুকৃতির ফলে হয়। তোমাদের কোন ভাবনা নেই। যাদের প্রাণে ঠিক ঠিক ত্যাগ-বৈরাগ্য রয়েছে তাদের কোন কালেই ভয় নেই। শ্রীভগবান তাদের হৃদয়ে প্রকটিত হবেন—দর্শন দিয়ে তাদের জীবন ধন্য করে দেবেন। আসল জিনিস হলো ত্যাগ-বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও ভগবানলাভের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। এখন খুবই শুভ মুহূর্ত—এ সময় অল্প সাধনভজনেই জীবের চৈতন্য হবে। ঠাকুরের

আগমনে ভগবানলাভের পথ অতি সুগম হয়ে গেছে। আর যে আধ্যাত্মিক স্রোত এসেছে তা বহু বৎসর চলবে—কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে এই উঠানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—যে স্রোত এসেছে তা অবাধে সাত-আট শত বৎসর চলবে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। এ যুগপ্রবাহ আপন শক্তিতে চলবে—কারো সাহায্যের অপেক্ষা করবে না। এসব ঐশী শক্তির ব্যাপার—মানুষ কি করবে? এ যুগপ্রয়োজন-সাধনে যে সহায়ক হবে সে নিজে ধন্য হয়ে যাবে।

ঠাকুর যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে জগতে এসেছিলেন এবং যে শক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে গেলেন, সেই ঐশী শক্তিকে অব্যাহত রাখবার জন্যই তো ঠাকুরের ইঙ্গিতে স্বামীজী এ ধর্মসঙ্ঘের গঠন করে গেলেন এবং এই মঠকে প্রধান কেন্দ্র করে ঐ কাজের সূচনা করেছেন। এই মঠই হলো আধ্যাত্মিক শক্তির power-house (উৎপত্তিকেন্দ্র); এখান থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত বয়ে গিয়ে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে। তাই তো তিনি নিজে মাথায় করে ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছিলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন—'তুই মাথায় করে নিয়ে আমায় যেখানে বসাবি আমি সেখানেই থাকব।' যে দিন এ মঠ প্রতিষ্ঠা হলো সে দিন স্বামীজী 'আত্মারাম'কে নিজে মাথায় করে নিয়ে এলেন এবং এ মঠে স্থাপন করলেন। পূজা, হোম, ভোগরাগ খুব হয়েছিল। আমি ঠাকুরের ভোগের পায়স রান্না করেছিলাম। ঠাকুরকে এ মঠে বসিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—'আজ আমার মাথা থেকে জীবনের সব চাইতে বড় দায়িত্ব নেমে গেল। এখন আমার শরীর গেলেও কোন ক্ষতি নেই।'

তারপর থেকে এখানেই সব ভজন-সাধন—'আত্মারাম'কে কেন্দ্র করে। স্বামীজী, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এঁরা সকলে এখানে কত ভজন-সাধন করেছেন! তাঁরা সকলেই অবতারকল্প মহাপুরুষ—ভগবানের পার্ষদ। অবতারের সঙ্গে ছাড়া এঁরা বড় একটা আসেন না। এত সব মহাপুরুষ এ মঠে কত ভজন-সাধন করলেন! ভেবে দেখ দেখি এ মঠ কি স্থান! স্বয়ং মা জগজ্জননী এখানে এসেছিলেন! শুনেছিলাম যে, এ মঠ স্থাপনের পূর্বেই মা গঙ্গায় নৌকা করে যাবার সময় ঠাকুরকে এস্থানে দর্শন করেছিলেন। এ মঠ হবার পরেও অবশ্য আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে গিয়েছি; কিন্তু আমাদের প্রাণ পড়ে থাকত মঠে 'আত্মারামে'র কাছে। এখন তো একে একে ঠাকুরের পার্ষদরা সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন—এবার তোমাদের পালা। ত্যাগ, তপস্যা ও ভজন-সাধন দ্বারা এ মঠের আধ্যাত্মিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এমন আদর্শ জীবন তৈরি করতে হবে যাতে লোকে তোমাদের সঙ্গ করে মনে করবে যে, সাক্ষাৎ ঠাকুরের ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করছে। ঠাকুরের ভাব বলতে এককথায় বুঝায়—ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য; আর ত্যাগ, তপস্যা ও সর্বধর্মসমন্বয়ই প্রকৃত জীবন।

জনৈক সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারতে এক শাখাকেন্দ্রে ঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য যাইতেছেন। তিনি প্রণাম করিয়া মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন—মহারাজ,

আশীর্বাদ করুন যাতে জীবনে ভগবানলাভ হয়। এতদিন আপনাদের কাছে কাছে ছিলাম, এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে সুদূর মাদ্রাজে—সে জন্য মনে খুবই কষ্ট হয়। এখন তো আর ইচ্ছা করলেই আপনাদের দর্শন পাব না। এখন আপনারা ধ্যানের বস্তু। ওদেশে গিয়ে কিভাবে থাকতে হবে তা একটু বলে দিন।

মহাপুরুষজী সন্ন্যাসীকে খুবই আশীর্বাদ করিয়া স্নেহভরে বলিলেন—বাবা, তোমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছ, তিনি সর্বদা তোমাদের রক্ষা করবেন। যেখানেই থাক এইটে ঠিক মনে রেখো যে, ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা তাঁর পরমপ্রিয়। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, এবং পবিত্র; তাঁকে লাভ করবে বলে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছ, তিনি কি তা জানেন না? আহা! আমি এক এক সময়ে ভাবি, স্বামীজী যদি স্থূল শরীরে এখন থাকতেন তা হলে এসব ছেলেদের দেখে কত না আনন্দ করতেন!

তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানেও ঠাকুরের বহু ভক্ত আছে। যা দেখেছ, যা আমাদের কাছে শিখেছ তাই তাদের বলবে। আসল কথা হলো ত্যাগ-তপস্যাপূর্ণ আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হবে। ঠাকুরের জীবন ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি। তোমরা তাঁরই পবিত্র সঙ্ঘের সন্ন্যাসী—তাঁরই ভাব প্রচার করতে যাচ্ছ। সব চাইতে বড় প্রচার হলো আদর্শ জীবন দেখানো—যাতে তোমাদের জীবন দেখে লোকে ঠাকুরকে ধরবার ও বুঝবার সুযোগ পায়। অতএব ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন যত গড়ে তুলতে পারবে ততই তোমাদের ভিতর দিয়ে তাঁদের ভাব বেশি প্রচার হবে। যখন নিজেকে দিশেহারা মনে করবে তখনই খুব কাতরপ্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—তিনি তো তোমার অন্তরাত্মা, অন্তরেই রয়েছেন। তিনি ভিতর থেকে আলো দেখাবেন—কি কর্তব্য তা ঠিক জানিয়ে দেবেন। তুমি যে কিছু প্রচার করতে যাচ্ছ, এ ভাব কখনো মনে আসতে দিও না। ঠাকুর নিজেই তাঁর ভাব প্রচার করেন। তুমি আমি তাঁকে কি প্রচার করব? তাঁকে কে বুঝতে পারে? অনন্তভাবময় ঠাকুর—তাঁর কি 'ইতি' করা সম্ভব? অমন যে স্বামীজী তিনিই বলেছেন—'ঠাকুর যে কি ছিলেন তা কিছুই বুঝতে পারলুম না'; অন্যে পরে কা কথা। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তুমি এখানে যেমন ভজন-সাধন, পড়াশুনা, সৎচর্চা এসব করছিলে, ওখানেও তাই করবে—বরং আরো বেশি করে করবে। তাতে তোমার নিজেরই কল্যাণ হবে। এখন তোমাদের সাধন-ভজন করার সময়—সেদিকেই জোর দেবে বেশি। আমি খুব প্রার্থনা করছি—ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতায় তোমার হৃদয় ভরে যাক—মানবজীবন ধন্য হোক।

## বেলুড় মঠ

২২ ভাদ্র, শনিবার অপরাহ্ণ, ১৩৩০ (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) ৺কাশী যাইতেছেন, সেই সম্পর্কে ৺কাশীবাসের কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—আমাকেও—বাবু অনেক করে ৺কাশী যাবার জন্য লিখেছে। দিনু বুড়ো (স্বামী সচ্চিদানন্দ) তো খুব ভয়ে ভয়ে লিখেছে—'শুনেছি আপনার শরীর বড় খারাপ যাচ্ছে, আপনি ৺কাশী চলে আসুন। আপনারা তো ঢের কাজকর্ম করেছেন, এখন সব ছেলেছোকরারা কাজকর্ম করুক না। আপনি এবার কাশী এসে বাস করুন।' দিনু বুড়োর ধারণা হয়েছে যে এ শরীর আর বেশি দিন থাকবে না, তাই শেষ সময়টা কাশীপ্রাপ্তি করাতে চায়। আমাদের বাবা, সকল জায়গাই কাশী; যেখানে যে অবস্থায়ই শরীর যাক না কেন, সবই কাশীপ্রাপ্তি। আর ঠাকুর যতদিন রাখবেন (হাসিতে হাসিতে) ততদিন কেউ মারতে পারবে না। 'রাখে প্রভু মারে কে?' আবার যখন ঠাকুর ডাকবেন তখনো কেউ রাখতে পারবে না। আমরা তো ready (প্রস্তুত) হয়ে বসে আছি। শেষ সময়ে কাশীতে বাস করব কাশীপ্রাপ্তি হবে বলে, এসব তো সাংসারিক লোকেরা করবে, সাধারণ লোকেরা করবে। আমরা তো আর এ জগতের লোক নই! ঠাকুর কৃপা করে আমাদের সব দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভক্তেরা যেখানেই দেহত্যাগ করুক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। সবই কাশীপ্রাপ্তি। এই যে সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে দেহ রাখল, তাতে হয়েছে কি? সে দেহান্তে তাঁর কাছেই গেছে। যার হৃদয়ে সেই বিশ্বনাথ ঠাকুর বিরাজ করছেন, তার হৃদয়ই তো কাশী। তার আবার ভয় কি?

●

## বেলুড় মঠ

২৩ ভাদ্র, রবিবার, ১৩৩০ (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

আজ রবিবার। মহাপুরুষ মহারাজ নিজ ঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ৯টা হইবে। ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন এবং নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। জনৈক ভক্ত একটু কৌতূহল-পরবশ হইয়া মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনার বয়স কত হবে?

মহারাজ—এ দেহের বয়স জিজ্ঞাসা করছ? তাতো ঠিক জানি নে। তবে বোধ হয় ৭০।৭২ বৎসর হবে।

ভক্ত—তা হলে তো আমার বয়সের প্রায় তিন গুণ।

মহারাজ—তা হবে। তিন গুণ—তিন গুণ কেন, অনাদিকাল থেকেই তো আমি আছি। অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অজর, অমর আত্মা। সকলের ভিতরই রয়েছেন সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব চৈতন্যদেব। আর এই যা দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশ, দুশ—এ সবই মায়িক। তিনি তো চিরকালই রয়েছেন, একই ভাবে—সত্যস্বরূপ, সনাতন পুরুষ। এই জগৎটা হলো মায়াময়, এবং এই মায়াময় অনিত্য জগৎটাকে সত্য বলে মনে করেই তো যত গোল। মরু-মরীচিকায় সত্যিকার জল আছে মনে করে মৃগগুলি টকাস টকাস করে লাফিয়ে গিয়ে পড়ে। দূর থেকে দেখায় যেন অনন্ত জলরাশি, আর তাতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে! তাতেই মুগ্ধ হয়ে জল পাবার আশায় মৃগগুলি ছুটে গিয়ে তাতে পড়ে আর প্রাণ হারায়। তেমনি এই মায়াময় অনিত্য জগৎটাকেও সত্যি বলে মনে করে মানুষ তাতে জ্বলে পুড়ে মরছে। একদিন এ দুনিয়া যে ছেড়ে যেতে হবে তা একটিবার ভুলেও ভাবে না; সব পাকা বন্দোবস্ত করতে চায়—পাকা বাড়ি, পাকা ঘর দোর, সব পাকা। আরে বাবা, যতই পাকা কর না কেন, ক-দিন?

উপস্থিত একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—একবার যান, গঙ্গায় হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে একটু বসুন। ঠাকুরঘরকে আমরা কৈলাস করে রেখেছি, বৈকুণ্ঠ করে রেখেছি। ওখানে ঠাকুর রয়েছেন, মা রয়েছেন; স্বামীজী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ—সকলেই রয়েছেন। আমি তো যখন ঠাকুরঘরে যাই, মনে হয় যেন কৈলাসে এলুম। মাঝে মাঝে গিয়ে বসি আর আনন্দ। আনন্দে প্রাণ ভরে যায়।

নিকটস্থ জনৈক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কখন ঠাকুরঘরে যাও?

সন্ন্যাসী—সকালে ৯টা/১০টার সময়, আর সন্ধ্যাবেলা।

মহারাজ—ভোরে যাও না?

সন্ন্যাসী—না মহারাজ, ভোরবেলায় বিছানায় বসে ধ্যান করি।

মহারাজ—বিছানায় বসে কেন? সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করবে। বিছানায় বসতে যাবে কেন; ও ভাল নয়। অবশ্য অন্যত্র যদি বসবার কোন সুবিধা না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা; তখন বরং বিছানায় বসবে। বিছানায় বসলেই আলিস্যি আসে আর ঘুম পায়। এ আমাদের খুব experience (অভিজ্ঞতা) আছে। বিছানা আর বালিশগুলো যেন টেনে শুইয়ে ফেলে। আমি তো পারতপক্ষে বিছানায় বসি নে। ভোরবেলা যখন দেখি যে ঠাকুরঘর খোলা হয় নি, তখন খানিকক্ষণ বিছানায় বসি, পরে ঠাকুরঘর খোলা হলেই সেখানে চলে যাই—আর আনন্দ! ঐ তো হলো ধ্যান-ভজনের প্রকৃষ্ট সময়। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ; সমগ্র প্রকৃতি শান্ত, মন অল্পেতেই ধ্যানস্থ হয়।

আমার তো তিনটে বাজলেই ঘুম ভেঙে যায়, তা যখনই শুইনে কেন। ঠাকুরকে দেখেছি, রাত তিনটে বাজলে আর কিছুতেই ঘুমুতে পারতেন না। অমনি তাঁর ঘুম খুব অল্প ছিল, এক ঘণ্টা দুঘণ্টা হলো তো ঢের। উঠেই ভগবানের নাম করতে শুরু করে

দিতেন। কখনো ওঁকার-ধ্বনি, কখনো বা হাততালি দিয়ে মায়ের নাম, বা বেড়িয়ে বেড়িয়ে হরিনাম করতেন। তাঁর ঘরে আমাদের যারা থাকত সকলকে ডেকে তুলে দিতেন। বলতেন—'ওরে, তোরা উঠলি? ওঠ, একবার উঠে ভগবানের নাম কর।' এই বলে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে তুলে দিতেন। আর তাঁর তো ওদিকে ক্রমাগত নামগান চলেছে, মাতোয়ারা ভাব! কখনো নাম করতে করতে পাশের বারান্দায় বেরিয়ে পড়তেন, বালকের মতো উলঙ্গ, বাহ্যিক কোনই হুঁশ নেই; কোন কোন দিন আবার কীর্তন শুরু করে দিতেন, সঙ্গে খোল করতাল বাজত। আমরাও তাতে যোগ দিতাম। তিনি বেশির ভাগই নামকীর্তন করতেন, আর মাঝে মাঝে নিজেই আখর দিতেন, কখনো বা ভাবাবেশে নাচতেন। আহা! কি মনোহর নৃত্য; সে সময় যেন অন্য লোক—তাঁকে চেনা যেত না। আহা! সে যে কি ভাবুকতা বলে বোঝাবার নয়! তাঁর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি ছিল—অমন মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনি নি। ঐভাবে চলত সকাল পর্যন্ত। সকলেই মাতোয়ারা হয়ে যেত। কেবল নাম আর নাম—যেন বৈকুণ্ঠধাম। কি আনন্দেই না তাঁর কাছে আমরা ছিলাম!

ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া মহাপুরুষজী ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন, আর যেন কথা বলিতে পারিতেছেন না।

## বেলুড় মঠ

১০ চৈত্র, রবিবার, ১৩৩০ (২৩ মার্চ, ১৯২৪)

রবিবার। বিকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। তিনি কাহাকেও কুশলপ্রশ্নাদি করিতেছেন, কাহারও বা প্রশ্নের জবাব দিতেছেন, কিন্তু মন যেন সর্বদাই অন্তর্মুখ। প্রায় তিনটার সময় একদল ভক্ত দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই মহাপুরুষজী আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—এই যে, এস। তোমরা সব কোত্থেকে?

তাঁহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বসিলে জনৈক ভক্ত বলিলেন—আমরা আজ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। ওখানে দর্শনাদি করে মার প্রসাদ পেয়েছি। বেশ আনন্দে দিনটি কাটিয়ে এলাম। ঠাকুরের ঘর, পঞ্চবটী, বেলতলা প্রভৃতি স্থানে গিয়ে মনে হলো যে এসব স্থানেই তো ঠাকুর কত সাধনা করেছিলেন!

মহারাজ—তা বই কি। ঠাকুর প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ঐ স্থানে বাস করেছিলেন, কত রকমের সাধন-ভজন, কত ভাব, মহাভাব ওখানে হয়ে গেছে! ঐ যে ঠাকুরের ঘর, ও কি কম স্থান গা? আমার মনে হয় দক্ষিণেশ্বরই কাশী—অন্য কিছু মনে হয় না। তাই মধ্যে মধ্যে যাই। সর্বদা যেতে পারি নে—এখান হতেই রোজ প্রণাম করি। অমন

স্থান কি আর আছে? কাশী যেমন এ সংসারের মধ্যে নয়, দক্ষিণেশ্বরও তাই।

ভক্ত—মহারাজ, আপনারা কাশীপুরে কখন এসেছিলেন এবং কি করেই বা স্বামীজী মহারাজ মঠ গড়ে তোলেন, সে-সব প্রসঙ্গ আপনার নিকট শুনতে খুবই ইচ্ছা হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন মনকে ধীরে ধীরে বহির্জগতের দিকে টানিয়া আনিতেছেন। পরে আস্তে আস্তে বলিলেন—ঠাকুরের যখন গলার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি, তখন চিকিৎসা ও সেবাদির সুবিধা হবে বলে তাঁকে শ্যামপুকুর হতে কাশীপুর বাগানে আনা হলো। আমরা সকলেও তাঁর সেবা করবার জন্য তখন আসি। পরে ক্রমে সেখানেই ঠাকুরের দেহত্যাগ হলো।

ভক্ত—ঠাকুরের যে দেহত্যাগ হয়েছিল আপনারা তা বুঝতে পেরেছিলেন?

মহারাজ—না, প্রথমটায় আমরা কেউই তা বুঝতে পারিনি। আমরা মনে করেছিলাম যে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন, কারণ তাঁর কখনো কখনো এমন গভীর সমাধি হতো যে দু-এক দিন পর্যন্ত সে অবস্থায় থাকতেন। তাই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন মনে করে আমরা খুব নাম শোনাতে লাগলুম। এইভাবে সারা রাত কেটে গেল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। পরদিন সকালে ডাক্তার (মহেন্দ্র) সরকারকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে নানা রকম পরীক্ষাদি করে বললেন যে ঠাকুর দেহরক্ষা করেছেন—জীবনের কোনরকম চিহ্ন তিনি পেলেন না। তিনিই আমাদের ঠাকুরের ফটো রাখতে বললেন। আমরা তাই করলাম, তারপর বেলা চারটা সাড়ে-চারটার সময় কাশীপুর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাঁর দেহের সৎকার করা হয়।

ভক্ত—তখন বোধ হয় খুব strain (শ্রম) ও কষ্টের মধ্যে আপনাদের দিনগুলি গিয়েছে।

মহারাজ—কই, strain বা কষ্ট বলে আমাদের তো তখন কিছুই মনে হতো না। আমরা একভাবে তখন দিন কাটাচ্ছি। ঠাকুরের সেবা, ধ্যান-জপ এবং তপস্যাদিতে এত মত্ত হয়ে থাকতুম যে দিনরাত কোন্ দিক দিয়ে যেত তার হুঁশই অনেক সময় থাকত না। সে এক সময়ই গেছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই বাড়ি গেলেন, কিন্তু গোপালদা, লাটু আর আমি গেলুম না। স্বামীজীও বাড়ি গেলেন, কিন্তু সর্বদাই যাতায়াত করতেন ও খবরাখবর নিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্মাস্থি রাখা হয়েছিল, তাই আমরা রোজ পুজো করতুম।

আমরা তখনো কাশীপুরের বাগানেই আছি, কারণ সেই মাসের ভাড়ার দরুন তখনো কয়েক দিন বাকি ছিল। তখন স্বামীজী প্রভৃতি আমরা সকলে পরামর্শ করলুম যে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে তাঁর অস্থি সমাহিত করতে হবে, কারণ ঠাকুরের তাই অভিমত ছিল কিন্তু তেমন স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে রামবাবুও ঐসব অস্থি কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। কিন্তু আমাদের সকলের মনেই খুব কষ্ট হতে লাগল,

বিশেষ এই ভেবে যে তাহলে ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করা হয় না। আমরা বলরামবাবুকে খবর দিলুম যে তিনি যেন একটা কলসী নিয়ে আসেন। খবর পেয়েই তিনি এলেন। আমরা সেই রাত্রেই ভস্মাবশেষ থেকে সব অস্থি বার করে নিয়ে কলসীতে ভরে কাদা দিয়ে মুখ বন্ধ করে কলসীটি বলরামবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম। তাঁদের বাড়িতে নিত্য ঠাকুরসেবা হতো; সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিরও পুজো হতে লাগল। রামবাবু ইতোমধ্যে অবশিষ্ট যে ভস্ম ছিল তাই কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে গেলেন। অস্থি বার করে নেওয়ার কথা আমরাও তাঁকে কিছু বলি নি, তিনিও তখন কিছুই জানতে পারেন নি। সেই অস্থিই এখন মঠে নিত্য পুজো হচ্ছে। স্বামীজী নিজে মাথায় করে কৌটাসমেত অস্থি মঠে নিয়ে আসেন। ঠাকুরের সেই অস্থির কৌটাকে স্বামীজী 'আত্মারামে'র-কৌটা বলতেন। আমরাও তাই বলি।

ভক্ত—ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আপনারা তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন কি?

মহারাজ—শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন যাওয়ার পরও ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন। যাই হোক, ইতোমধ্যে আমিও বৃন্দাবনে চলে গেলুম। স্বামীজী রোজই বলরামবাবুর বাড়িতে আসতেন, আর কেমন করে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় সেই বিষয় চিন্তা ও আলোচনাদি করতেন। একদিন হঠাৎ সুরেশবাবু এসে স্বামীজীকে বললেন—'ভাই নরেন, কাল রাত্রে ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে বললেন—সুরেশ, আমার ছেলেরা সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুই তাদের জন্য কি করলি? ঠাকুরের ঐ কথা শুনে অবধি আমি মহা অশান্তিতে আছি। তুমি ভেবে চিন্তে যা হয় একটা কিছু কর। তুমি যা করবে আমি তাতেই রাজি আছি।'

স্বামীজীও তাঁর ইচ্ছা এইভাবে আশ্চর্য উপায়ে পূর্ণ হওয়ায় খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন—'আমিও এই বিষয়েই কিছুদিন থেকে ভাবছি। তা বেশ। একটি বাড়ি ঠিক করতে পারলে ভাল হয়। এতে আপনার কি মত?' সুরেশবাবু তাতেই সম্মত হলেন। বাড়ির খোঁজ হতে লাগল। বরানগরে দশ টাকা ভাড়ায় একখানি দোতলা বাড়ি পাওয়া গেল। বাড়িটি খুব পুরানো। পাড়ার লোকেরা সেটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বলত—ভয়ে ওদিকে কেউ মাড়াত না। ততদিনে আমিও বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলুম। স্বামীজী আমাকে দেখে বললেন—'তারকদা, আপনি এসেছেন, বেশ হয়েছে। আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম। বরানগরে বাড়িভাড়া পাওয়া গেছে, চলুন সেখানে।' আমরা তথায় এসে থাকতে লাগলুম। তখন সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য। সাধন-ভজন, পূজাপাঠ খুব চলেছে। দিন রাত সমভাবে কেটে যেত। ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ পর্যন্ত থাকত না। খুব ভজন-কীর্তনও হতো। এক এক সময় এমন নৃত্য হতো যে, নিচে যে একটি দারোয়ান ছিল সে ভয়ে অস্থির হয়ে যেত পাছে দালান ভেঙে পড়ে। খুব আনন্দে আমাদের দিন কাটত। এমনি করে সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যাদির ভেতর দিয়ে আমাদের সঙ্ঘের গোড়াপত্তন।

১৭ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ (১ জানুয়ারি, ১৯২৪)

আজ ১ জানুয়ারি। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব। মঠেও ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির আয়োজন হইয়াছে। ভোর হইতেই ভক্তসমাগম আরম্ভ হইয়াছে, বিশেষত ছুটির দিন বলিয়া। ভক্তগণ ঠাকুরদর্শনাদি করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সমবেত হইয়াছেন। তিনিও আনন্দে সকলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন। জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে প্রণামানন্তর উপবেশন করিয়া বলিলেন—Happy New Year (শুভ নববর্ষ)। মহাপুরুষজী হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—Happy English New Year (শুভ ইংরেজী নববর্ষ)। আমাদের শুভ নববর্ষ তো বৈশাখ। আজ তো ইংরেজদের শুভ নববর্ষ। এই দেখ না দেড় শত বৎসরের ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমাদের মনোবৃত্তি কি হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়ত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আমরা শুধু পরাধীন জাত বলে যে এ অবস্থা হয়েছে তা নয়। পরাধীন তো আমরা অনেক কাল। মুসলমানরা আট-নয় শত বৎসর অধীনে রেখেও আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি নষ্ট করতে পারে নি, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার এমনই সম্মোহনী শক্তি, আর ওরা এমন কৌশলে তাদের ভাবধারা আমাদের মধ্যে প্রচার করিয়েছে যে, আমরা বুঝতেই পাচ্ছি নে—আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করাই তাদের উদ্দেশ্য! তার ফলে এত অল্পদিনের মধ্যেই অত বড় জাতটা খুব বেশি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছে সব বিষয়ে। ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তাধারাও আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সব চাইতে বড় অনর্থ এই হয়েছে যে, সমগ্র হিন্দুজাতটা ক্রমে বৈদিক ধর্মে আস্থাশূন্য হয়ে পড়েছে। সনাতন হিন্দুধর্মে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা ও কাল্পনিক, আর খ্রীস্টধর্মের ধ্বজাধারীরা যা বলছে সবই ধ্রুবসত্য—এই দাঁড়িয়েছে সাধারণের মনোবৃত্তি। ওদের মতলব ছিল ক্রমে সারা হিন্দুজাতটাকে খ্রীস্টান করে ফেলবে; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তা হলো না। এ সনাতন বৈদিক ধর্ম লোপ হয়ে গেলে যে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে—সে জন্যই তো এ সনাতন ধর্মকে রক্ষা করতে ভগবান অবতীর্ণ হলেন রামকৃষ্ণরূপে। আর ভগবানের যে সাকার উপাসনাকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ পৌত্তলিকতা বলে এতকাল উপহাস করে আসছিল, তিনি তাঁর সাধনা শুরু করলেন সেই মূর্তিপূজা থেকে। তাঁর সব ভাবের সাধনা এবং সিদ্ধি সমগ্র জগৎকে চমৎকৃত করেছে—ফলে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় মনীষিগণও ভারতীয় বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য অবনতমস্তকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন; তার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ অন্ধানুকরণপ্রিয় ভারতবাসীদেরও দৃষ্টি পড়েছে ঠাকুরের জীবনের উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মের উপর। ঠাকুরের আসার পর থেকেই

দেশের হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ভারতবাসী যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে আত্মবিশ্বাস ক্রমে ফিরে আসছে; ঠাকুরের অলৌকিক সাধনার ফলে ভারতের আত্মশক্তি জেগে উঠেছে। এখন দেখবে দিন দিন ভারতের অভূতপূর্ব উন্নতি হবে সব বিষয়ে। স্বামীজী বলেছেন যে, ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ঐ মেরুদণ্ডই ভেঙে পড়েছিল; তাই ভারত হয়ে গিয়েছিল সব বিষয়ে হীনবল ও দুর্বলচেতা। ঠাকুর এসে সে মেরুদণ্ড আবার সুস্থ ও সবল করে দিয়েছেন; এখন ভারত খালি ধর্মে নয় সর্ব বিষয়ে সমগ্র জগৎকে তাক লাগিয়ে দেবে।

যে শক্তির প্রভাবে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠাকুর সেই ব্রহ্মশক্তিকে জাগরিত করেছেন। তিনি যে কি করে গেছেন জগতের কল্যাণের জন্য—জগৎ ক্রমে তা বুঝবে। আহা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ঐ সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে ছিলাম—তাঁর দর্শন, স্পর্শন ও সেবাদি করতে পেরেছিলাম! তাঁর স্পর্শে আমাদের জীবনও ধন্য হয়ে গেছে। তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য যাদের হয় নি অথচ তাঁর ভাব আশ্রয় করে নিজেদের জীবন গঠন করছে, তাঁকেই জীবনের আদর্শ করছে, তারাও ধন্য হয়ে যাবে। সর্বভাবময় প্রভু—তিনি ত্রিলোকেশ্বর, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বাঞ্ছাকল্পতরু। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এ চতুর্বর্গের যে যা প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে, তিনি তাকে তাই দেবেন। তাঁর কথা আর কি বলব?

ভক্ত—আজকের দিনে তো তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন—কত ভক্তদের কৃপা করেছিলেন।

মহাপুরুষজী—কেবলমাত্র আজকের দিনে তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন—তা কেন? তিনি তো সদাই কল্পতরু। জীবকে কৃপা করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। আমরা তো চোখের সামনে দেখেছি, তিনি নিত্যই কত জীবকে কত ভাবে কৃপা করতেন। হাঁ, কাশীপুরের বাগানে এই দিনে তিনি একসঙ্গে অনেক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। সে হিসাবে আজকের দিনের একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি যে কৃপাসিন্ধু ছিলেন, তা সেদিনকার ঘটনায় ভক্তেরা বিশেষ করে বুঝতে পেরেছিলেন।

ভক্ত—মহারাজ, আপনি সেদিন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?

মহাপুরুষজী—না। আমি কেন, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে কেহই সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুরের তখন কঠিন অসুখ, আর আমাদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। ঠাকুরের শরীর এমনই অসুস্থ ছিল যে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর সেবার জন্য আমরা পালা করে থাকতুম। ভক্তেরা সকলে দিনের বেলায় সময়-সুবিধা মতো আসতেন, ঔষধপথ্যাদি ও খরচপত্রের সব ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু তাঁর সেবার সম্পূর্ণ ভারই ছিল আমাদের উপর। আর তাঁর সেবার সঙ্গে চলেছিল খুব সাধন-ভজন। ঠাকুরও সে বিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। পৃথকভাবে প্রত্যেককে ডেকে ভজন-সাধন

সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং কার কেমন ধ্যান ও দর্শনাদি হচ্ছে সেসব খোঁজ নিতেন। রাত্রে স্বামীজী ধুনি জ্বালিয়ে আমাদের নিয়ে ধ্যানজপ করতেন—কখনো খুব ভজন-কীর্তনও হতো। পালা করে ঠাকুরের সেবা আর ধ্যান-জপাদিতে সারারাত খুবই আনন্দে কেটে যেত।

রাত জাগা হতো বলে দুপুরবেলা খাওয়ার পরে আমরা প্রায় সকলেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতুম। সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পরে, নিচের হলঘরের পাশে যে ঘরটি ছিল সে ঘরে আমরা ঘুমুচ্ছিলাম। সেদিনই বিকেলবেলা ঠাকুর একটু বাগানে বেড়াবার জন্য প্রথম নিচে নামেন। ছুটির দিন বলে অনেক ভক্তই সে সময় বাগানে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরকে নিচে নামতে দেখে ভক্তেরাও আনন্দে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুর বাগানের ফটকের দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় গিরিশবাবু ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। গিরিশবাবুর অদ্ভুত ভক্তিবিশ্বাসপূর্ণ কথা শুনতে শুনতে ঠাকুর দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভক্তেরা তখন ঠাকুরের ঐ দিব্য ভাবাবেশ দেখে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলে উচ্চধ্বনি করে ঠাকুরকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। ক্রমে ঠাকুরের মন অর্ধবাহ্যদশায় নেমে এলো। তখন তিনি কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি আর বলব! তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তদের প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। তাঁরা খুব 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করে ঠাকুরকে প্রণাম করতে লাগলেন। তিনিও ঐ অবস্থায় একে একে প্রায় সকলকেই 'চৈতন্য হোক' বলে স্পর্শ করে সকলের চৈতন্য করে দিলেন। তাঁর ঐ দিব্যস্পর্শে ভক্তদের প্রত্যেকের ভিতরই অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। তখন কেউবা ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন, কেউ কাঁদতে লাগলেন, আবার কেউ বা উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার! আর ঠাকুর দাঁড়িয়ে আনন্দে দেখছিলেন সেসব। ঐ গোলমালে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমরা ছুটে এসে দেখি যে, ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে ঘিরে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করছেন; আর তিনি মধুর হাসিমুখে সস্নেহে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন ঠাকুরের মন সহজাবস্থায় ফিরে এসেছে; কিন্তু ভক্তেরা তখনো সেই আনন্দের নেশায় মশগুল। পরে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে সব ব্যাপার জানা গেল। সকলেই বলেছিলেন যে, ঠাকুরের স্পর্শে তাঁদের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল এবং সেই ভাবের প্রভাব দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল। তাঁর স্পর্শে হবে না তো কি? তিনি যে স্বয়ং ভগবান।

সেদিনও কিন্তু ঠাকুর দু-এক জনকে স্পর্শ করেন নি। বলেছিলেন—'এখন নয়, পরে হবে।' তাতেই বেশ বোঝা যায় যে, সময় না হলে কিছুই হয় না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ভক্ত—তিনি তো মহারাজ, ইচ্ছামাত্রই জীবের মন ভগবন্মুখী করে দিতে পারেন, হৃদয় পবিত্র করে দিতে পারেন; তা করেন না কেন? তাঁর কৃপা যদি সাধন-ভজনসাপেক্ষ হলো, তা হলে তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু কি করে হলেন?

মহাপুরুষজী—হাঁ, তুমি যা বলছ তা ঠিকই। অমনি বলতে হয়, তাই বলা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভজন-সাধন দ্বারা লভ্য নন। আবার তিনি যে 'লভ্য' একথাও বলা চলে না, কারণ প্রত্যেক জীবের স্বরূপই তিনি—তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। যেসব আবরণের দ্বারা জীবের অন্তর্দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে থাকে, ভজন-সাধন সেইসব আবরণগুলি দূর করে মাত্র। তখন জীব স্ব-স্বরূপকে জানতে পারে—অন্তরাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। তিনি কৃপা করে জীবকে অজ্ঞান-আবরণ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন বলেই তো জীবের প্রাণে তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়—এই তাঁর কৃপা। তবে সবই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন একটি শিশুকে নিমেষের মধ্যে বড় করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক ও নেহাত জোর করে করার প্রচেষ্টা মাত্র—এও ঠিক তেমনি। দেহমনের ক্রমবিকাশ হতে হতে শিশু ক্রমে বালকত্ব, যুবত্ব, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে উপনীত হয়; তেমনি জীবের মনে ভগবদ্ভাব-স্ফুরণেরও স্তর আছে, ক্রম আছে। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যে বিকাশ হয় তাই ঠিক এবং তারই ফল হয় ভাল। অবশ্য শ্রীভগবান ইচ্ছামাত্র একদিনে সব জীবকে মুক্ত করে দিতে পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান; কিন্তু তিনি তা করেন না। একই নিয়মে তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন; নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা হতে দেন না বিশেষ কারণ না হলে।

তিনি অহেতুকী কৃপাসিন্ধুও বটেন, সন্দেহ নেই। তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি তাঁর যে কত কৃপা, কত দয়া, তা যদি একটুও জানতে পারতে, তা হলে তিনি কৃপাসিন্ধু কি না, এ প্রশ্নও মনে স্থান পেত না। এই যে জীব-দুঃখে কাতর হয়ে জীবোদ্ধারের জন্য স্থূল দেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন—এই তো সব চাইতে বড় প্রমাণ যে, তিনি কৃপাসিন্ধু। তিনি তো সদা পূর্ণ, তাঁর পাবার বা চাওয়ার কিছু নেই। অথচ তিনি কৃপাপরবশ হয়ে জীবোদ্ধাররূপ কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রাণে একমাত্র বৃত্তি আছে, তা হলো কৃপা—প্রেম। তিনি যে কত কৃপাময় তা কি বলে বোঝানো যায়? ও হলো অনুভবের বিষয়। মানুষ খেলায় মত্ত—তাঁর কৃপা জানতে চাচ্ছে কোথায়? ঠাকুর বলতেন—'জীব ভগবানের দিকে এক পা এগুবার চেষ্টা করলে ভগবান তার দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।' এতো তাঁর দয়া! তাঁর কৃপায় সন্দেহ করো না—ও ভাব মনে আসতেও দিও না। তাঁকে ডেকে যাও প্রেমের সহিত; তাঁর কৃপায় প্রাণ-মন ভরে যাবে। ও-সব উপলব্ধি কি একদিনে হয়—না হঠাৎ হয়? ক্রমে সব হবে, সব পাবে। আমরাও ঠাকুরকে না দেখলে কি ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম যে, ভগবানের কত কৃপা জীবের উপর? তিনি কৃপা করবার জন্য ছটফট করতেন—কাঁদতেন। তাঁর কৃপা আন্তরিকভাবে চায় কে? মানুষ তো মত্ত হয়ে আছে বৈষয়িক আনন্দে। ভগবৎ-আনন্দ যে চায় সে পায়ও।

## বেলুড় মঠ

### শ্রাবণ, ১৩৩১ (আগস্ট, ১৯২৪)

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে-আটটা। মহাপুরুষ মহারাজ নিজঘরে খাটের উপর বসিয়া জামতাড়া আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। বলিলেন, আজ—র একখানা চিঠি পেলাম। তাতে সে নিজের বিষয়ই বিশেষ করে লিখেছে। তোমাকে নাকি একদিন রাত্রে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল, এবং রাত দশটার পর আশ্রমে ফিরে গিয়ে দৈনিক নিয়মিত জপ না করেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। কতক রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হলো যে জপ তো করা হয় নি, জপ করতে ভুল হয়ে গেছে, তখন তার মনে ভারি আক্ষেপ। আশ্রমের আর আর সাধুদের জিজ্ঞাসা করেছিল—জপ করা হয় নি, সেজন্য কি কর্তব্য? তারা কেউ কিছু বলতে পারে নি। তার মনে কিন্তু ভারি অশান্তি ও তীব্র অনুতাপ হয়েছে। তাই আমাকে লিখেছে যে এর কি হবে। একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান করতে লিখেছে। আমিও তাই লিখে দেব।

জনৈক ব্রহ্মচারী—এর কি প্রায়শ্চিত্ত হবে, মহারাজ?

মহারাজ—প্রায়শ্চিত্ত আর কি? একদিন উপোস করবে। সারা দিনরাত উপোসী থেকে যত পারবে জপ করবে। অবশ্য একেবারে নির্জলা উপোস নয়, সামান্য সামান্য দু-এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি খাবে। রাতে যতক্ষণ পারবে জপ করবে, অন্তত দশ হাজারের কম যেন না হয়। এরূপ নিষ্ঠা থাকা খুব ভাল।

জনৈক সন্ন্যাসী—আমাকেও মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছিলেন —'তুই রোজ দশ হাজার করে জপ করিস, ভাল হবে। অন্তত এক বৎসর এরূপ করিস।' আমি কিন্তু এক বৎসর ক্রমান্বয়ে ওরূপ জপ করতে পারি নি। আজকাল তো আশ্রমের কাজকর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ধ্যানজপের মোটেই সময় হয়ে উঠে না।

মহারাজ—এমনটা কখনো কখনো হয় যে কাজকর্মের চাপে ধ্যানজপ কমে যায়। তবে একেবারে না করা ভাল নয়। অবশ্য কাজকর্মও তাঁরই, তাতেও তাঁরই স্মরণ-মনন হয়, কিন্তু তা বলে জপ-ধ্যান একেবারে বাদ দিলে তো চলবে না! কাজকর্ম আর কতদিন? এমন সময় আসবে যখন আর কাজকর্ম করার শক্তিসামর্থ্য থাকবে না। তখন কি নিয়ে থাকবে বল? তা ছাড়া ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন যদি সঙ্গে সঙ্গে না থাকে, তা হলে কাজের ভাবই নষ্ট হয়ে যাবে। তখন শ্রীভগবানের কাজ ভুলে গিয়ে নিজের কাজ বলে মনে হয়, অহংকার-অভিমান এসে জোটে, এবং কাজে চিত্ত শুদ্ধ না হয়ে অশুদ্ধ হতে থাকে। জীবনের উদ্দেশ্য তো আর কাজ করা নয়, ভগবানলাভই হলো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে কাজ তাঁকে ভুলিয়ে দেয় সে তো মহা অকাজ। শত কাজের ভিতর নিয়মমত জপ-ধ্যানাদি করতে হবে, এবং তা থেকেই ঠিক ঠিক চিত্তের প্রসন্নতা আসবে। আর তখনই মানুষ হবে কর্ম করবার ঠিক ঠিক অধিকারি।

## দেওঘর

১৩৩৩ (১৯২৬, গোড়ার দিকে)

বিদ্যাপীঠের নূতন জমিতে গৃহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে অনেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সহ দেওঘরে আসেন। তাঁহার শুভাগমনে তথায় নিত্য আনন্দোৎসব চলিতেছিল। মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গে সকলেই প্রাণে এক আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তিনিও ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে খুবই আনন্দে ছিলেন। একদিন অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট সমবেত হইয়াছেন এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছু বলুন, শুনতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।

মহাপুরুষজী স্মিতমুখে বলিলেন—সে-সব পুরান খবর। শুনে আর কি হবে? সে এক সময় খুব করা গেছে; এখন তো ঠাকুর আমাদের এ কর্ম-বৃত্তান্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্মপ্রচারের জন্য এখন এরূপই প্রয়োজন। তাই এ বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দেব—করছিলামও তাই; কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়? দেখ না, খেটে খেটে স্বামীজীরই কত অল্প বয়সে শরীর চলে গেল। তিনি তো হিমালয়ে তপস্যা করতে কতবার গিয়েছিলেন; কিন্তু কে যেন তাঁকে টেনে হিমালয়ের ক্রোড় থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর তিনি রাজপুতানা প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরতে লাগলেন, কত রাজা মহারাজার সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল। ঘুরতে ঘুরতে পোরবন্দরে এলেন; তখন সেই স্টেটের রাজা ছিল না—নানারকম অব্যবস্থা চলেছিল। সেজন্য গভর্ণমেণ্ট শ্রীশঙ্কর রাওকে[১] administrator (কার্যনির্বাহক) করেছিলেন। শ্রীশঙ্কর রাও খুবই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অতি সৎলোক ছিলেন। ইউরোপের নানা স্থান ঘুরেছিলেন এবং ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষাও বেশ শিখেছিলেন। তাঁর বাড়িতে তাঁর নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; নিজেও খুব পড়াশুনা করতেন। তাঁর পুস্তকালয় দেখে স্বামীজীর ভারি লোভ হলো। কথায় কথায় শ্রীশঙ্কর রাওকে ইচ্ছা জানাতে তিনি খুবই খুশি হয়ে বললেন—'আপনার যতদিন ইচ্ছে এখানে থেকে পড়ুন' তখন স্বামীজী কিছুদিন ওখানে থেকে গেলেন।

শঙ্কর রাও বেশ ভাল সংস্কৃত জানতেন। একদিন তিনি স্বামীজীকে বলেন—'দেখুন স্বামীজী, আগে শাস্ত্রাদি পড়ে মনে হতো যে, শাস্ত্রগুলির মধ্যে যেন কোন সত্য নেই, ওগুলো সব শাস্ত্রকারদের মাথার খেয়াল—যার যা ইচ্ছে তাই লিখে গেছেন। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে ও আপনার সঙ্গ করে আমার সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থাদি সবই ঠিক। আমি পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি যে, ওদেশের

১ শ্রীশঙ্কর রাও পাণ্ডুরঙ্গ।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের হিন্দুধর্ম, দর্শন ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক। কিন্তু এমন লোক তারা এখনো পায় নি যিনি তাদের নিকট এসব শাস্ত্রাদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি যদি ওদেশে গিয়ে আমাদের বৈদিক ধর্ম তাদের নিকট ব্যাখ্যা করেন তো খুব বড় কাজ হয়।'

এই দেখ, কিভাবে তাঁর কাজের সূচনা হয়। তা শুনে স্বামীজী বললেন—'তা বেশ তো! আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছে এদেশ ওদেশ কি? দরকার হলে যাব।' তখন শঙ্কর রাও বললেন—'ওদেশে অভিজাতসম্প্রদায়ে মিশতে হলে ফরাসী ভাষা শেখা দরকার। আপনি ফরাসী শিখুন—আমি আপনাকে ফরাসী শেখাব।' তখন তিনি বেশ ফরাসী শিখে ফেললেন। আমি তখন আলমবাজার মঠে রয়েছি। স্বামীজী তার পূর্বে প্রায় দু-বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ। তিনি যে কোথায় আছেন তা কেউ জানত না—আলমবাজার মঠ দেখেও যান নি। হঠাৎ একদিন মস্ত চার-পাতা এক চিঠি এসে হাজির। কি ভাষায় যে ও চিঠি লেখা তা আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না। শশী মহারাজ ও সারদা সামান্য ফরাসী জানত তারা অনেক দেখে বললে—'এ তো নরেনের চিঠি বলে মনে হচ্ছে—ফরাসী ভাষায় লেখা।' তখন ঐ চিঠি নিয়ে কলকাতায় অঘোর চাটুয্যের কাছে যাওয়া হলো। তিনি হায়দরাবাদ স্টেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—বেশ ভাল ফরাসী জানতেন। তিনি ঐ চিঠি পড়ে আমাদের বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন। তখন স্বামীজীর খবরও পাওয়া গেল, আর জানা গেল যে তিনি ফরাসী ভাষা শিখেছেন।

হাঁ, আগে বলেছিলাম যে স্বামীজী ধ্যান-জপ ও তপস্যাদিতে জীবন কাটিয়ে দেবার মতলব করেছিলেন; কিন্তু যে মহাশক্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি তাঁকে তা করতে দিলেন না—জগতের উদ্ধারের জন্য যুগধর্মপ্রচাররূপ কার্যে নিয়োজিত করলেন। তিনি তো যোগিরাজ, ইচ্ছা করলেই সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারতেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে তীব্র কর্মের ভিতর টেনে আনলেন। তোমাদের সকলকেও তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রতিষ্ঠার সহায়করূপে নিয়োজিত করেছেন। যাকে তিনি ডেকেছেন সেই ধন্য।

জনৈক সন্ন্যাসী—তপস্যা এবং সাধন-ভজনেরও তো প্রয়োজন আছে? আপনারা কত করেছেন!

মহাপুরুষজী—হাঁ, ভজন-সাধনের খুবই দরকার—তপস্যাও চাই। জীবনের গতি ভগবন্মুখী করে রাখবার একমাত্র উপায় ভজন-সাধন, কিন্তু সে ভজন-সাধন ও তপস্যা কি শুধু এক রকমই? এই যে তোমরা কত কষ্ট সহ্য করে, কত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ভগবানের কাজ করছ, এও এক রকমের তপস্যা। সর্বক্ষণ প্রাণে এই ভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যে, যা সব কাজ করছ সবই তাঁর কাজ, তাঁরই সেবা—তোমাদের কিছুই নয়। এও এক রকমের সাধনা। তিনি কৃপা করে তোমাদের তাঁর কাজের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন; তাতে তোমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। এটা ঠিক জানবে যে, তাঁর

যুগধর্মসংস্থাপনের কাজ কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য আটকায় না। যার ভাগ্য ভাল সেই তাঁর কাজ করতে পারে। কত লোক দেখেছি নানা গুণ আছে; কিন্তু ঠাকুর তাদের গ্রহণ করেন না। আবার কেউ কেউ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় অকর্মণ্য, কিছু নয়; অথচ ঠাকুর তাদের দিয়ে আশ্চর্যরূপে কত কাজ করিয়ে নেন। যে তাঁর কাজ করবার সুযোগ পায় সেই ধন্য হয়ে যায়। তাই তো স্বামীজী বলতেন যে, ঠাকুর ইচ্ছামাত্র লাখ বিবেকানন্দ তৈরি করে নিতে পারেন। এ ভাব সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে যে, তাঁর কাজ করে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে গেল। ভগবানের কাজ করতে করতে কর্মীদের ভক্তি, বিশ্বাস ক্রমে হবেই হবে—নিশ্চয় জেনো। যারা পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মাধুকরী করে সাধন-ভজন করছে, তাদের তপস্যার চাইতে তোমরা যা করছ, এও কোন অংশে কম নয়। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই যুগধর্ম।

জনৈক সন্ন্যাসী—কাজকর্ম করতে করতে মাঝে মাঝে খুব অহংকার, অভিমান ইত্যাদি এসে পড়ে।

মহাপুরুষজী—যতক্ষণ ভগবানের কাজ করছ এ বুদ্ধি ঠিক থাকবে, ততক্ষণ অহংকার ইত্যাদি আসতে পারে না। ভাব ঠিক থাকলে কোন ভয় নেই। কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ধ্যান-জপটিও রাখা চাই—ওতে সাম্যভাব ঠিক রেখে দেয়। একটু-আধটু অহংকার, অভিমান এলেও তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই—তিনি আবার ঘটনাচক্রে ফেলে ওসব দূর করে দেন। অহংকার, অভিমানের কথা যা বলছ তা যারা তপস্যা করতে যাচ্ছে, তাদেরও তো এই অভিমান এসে যেতে পারে যে, আমি মস্ত বড় তপস্বী হয়েছি। আসল কথা কি জান? ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকলে ঠিক ঠিক তপস্যাও হবে না, ঠিক ঠিক কাজও হবে না। মন মুখ এক রেখে কাজই কর, আর তপস্যাই কর, কোন অবস্থাতেই অহংকার-অভিমান আসতে পারে না। উদ্দেশ্যের দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখা দরকার—জীবনের লক্ষ্য যাতে ভুল না হয়।

## উতকামণ্ড

১৩৩৩ (১৯২৬)

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ মাদ্রাজ হইতে ৪ জুন নীলগিরি পর্বতে আসেন এবং তথায় দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ বালাজীর (তিরুপতির) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্ম-নিবাস শ্রীহাতিরামজী মঠ নামক বাড়িতে অবস্থান করেন। উতকামণ্ডের আবহাওয়া অতি সুন্দর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড়ই মনোরম। উচ্চতা সমুদ্র হইতে প্রায় আট হাজার ফুট। ওখানে মাদ্রাজ গভর্ণরের গ্রীষ্মনিবাস আছে। ১৯২৪ সালের মে মাসের প্রথমভাগে মহাপুরুষজী

আর একবার নীলগিরি পর্বতে আসিয়াছিলেন এবং উতকামণ্ড হইতে দশ-বার মাইল নিচে কুনুর নামক স্থানে কয়েক মাস বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি উতকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

উতকামণ্ডে আসা অবধি মহাপুরুষজী অধিকাংশ সময়ই একাকী নিজের ভাবে থাকেন—লোকজনের সঙ্গ বড় একটা পছন্দ করেন না। অবশ্য স্থানীয় ভক্তগণ নিত্যই অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং নানাবিধ ধর্মপ্রসঙ্গাদি শ্রবণ ও তাঁহার পূত আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরিয়া যান। তাঁহার ভগবদ্‌ভাবে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভক্তসঙ্গ ছাড়া অন্য সময় তিনি আত্মারাম হইয়া যেন 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে' ডুবিয়া থাকেন। বহির্জগৎ হইতে মন দিনের পর দিনই উঠিয়া যাইতেছিল এবং ক্রমেই তিনি বেশি গম্ভীর ও অন্তর্মুখ হইয়া পড়িতেছিলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা বা মেলামেশা যাহা হইত তাহা কেবল সরলমতি পাহাড়ী বালক-বালিকাদের সঙ্গে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যখন তিনি একাকী বেড়াইতে যাইতেন তখন সঙ্গে লইয়া যাইতেন কিছু পয়সা ও খাবার। পথে পথে সেই পয়সা ও খাবার বিলাইতেন ছোট ছোট পাহাড়ী বালক-বালিকাদের মধ্যে, আর তাহাদের সঙ্গে এমন সরলভাবে মিশিতেন যেন তাহারা তাঁহারই সমবয়সী।

শ্রীহাতিরামজী মঠে নিজ প্রকোষ্ঠে যখন তিনি একাকী বসিয়া থাকিতেন তখন অধিকাংশ সময়ই মুদ্রিতনয়ন অথবা উদাসদৃষ্টি, যেন কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তাঁহার মন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে সময় তাঁহার নিকট যাইতে ভয় হইত। সমগ্র মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঐ নীলগিরি পর্বতের গভীর নীরবতার মধ্যে জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দিবেন, তাও কখন কখনও বলিতেন। কোন কিছুতেই যেন আঁট নাই, সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত ভাব।

একদিন সকালে বেড়াইয়া আসিয়া তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে চুপচাপ বসিয়া আছেন, কাঁচঘেরা প্রকাণ্ড জানালার দিকে মুখ, ঢেউখেলানো নীল পর্বতমালার উপর দৃষ্টি যেন নিবদ্ধ। জনৈক সেবক ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে অত্যন্ত উদাসভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শঙ্কিতপ্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার শরীর ভাল আছে তো, মহারাজ? মনে হইল, সেবকের প্রশ্নে তাঁহার চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও প্রশ্নটি তাঁহার কানে পৌঁছায় নাই। তিনি তৎকালীন নিজ চিন্তাধারাই ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—দেখ্, এস্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অতি চমৎকার। মন স্বতই অসীমের দিকে ছুটে যায়। এখানে যে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা আমার ধারণাই ছিল না। এখন যত দিন যাচ্ছে ততই সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি; আর ভাবছি ঠাকুরের দয়ার কথা। তিনি কৃপা করে এসব দিব্য অনুভূতির আনন্দ দেবেন বলেই বোধ হয় আমায় এখানে এনেছেন। বহু বৎসর পূর্বে হিমালয়ে যখন ছিলাম তখন

ঠিক এমনটি অনুভব হতো। মনের সহজ গতিই ধ্যানের দিকে। আপনা হতেই মন স্থির ও শান্ত হয়ে আসে। জোর করে মনকে নামিয়ে আনতে হয়। এখানে প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই অনেক মুনি ঋষি কঠোর তপস্যা করেছিলেন; তাই এখনো এমন একটা জমাটবাঁধা ভাব রয়েছে। এ স্থান তপস্যার খুবই অনুকূল। সেদিন চি—ওরা বলছিল যে, এখানকার জঙ্গলে নানাপ্রকার ফল আছে। ঋষিরা বোধ হয় ঐসব ফলমূল খেয়ে এখানে তপস্যা করতেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—সেদিন এমনি করে ঐ নীল পাহাড়ের সারির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছি; দেখি যে, এ শরীর থেকে একজন বেরিয়ে এসে ক্রমে সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। এইমাত্র বলিয়াই তিনি একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন—ঠাকুরই আমার অন্তরাত্মা, তিনিই এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'।

নীরবে খানিকক্ষণ মুগ্ধভাবে অপেক্ষা করিয়া সেবক করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের কি এসব অনুভূতি কিছু হবে না, মহারাজ? এখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার যে কি বিশেষত্ব আছে তা তো, মহারাজ, মোটেই বুঝতে পারি নে।

মহাপুরুষজী—দেখ, বাবা, অনুভূতি করিয়ে দেবার একমাত্র মালিক তিনি। তাঁকে ধরে থাক, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর, যখন যা দরকার তিনিই কৃপা করে সব দেবেন। মনের প্রভু তো তিনিই—সেই পরমাত্মারূপী ঠাকুর। তিনি দয়া করে মনের একটু মোড় ফিরিয়ে দিলেই মত্তকরিসদৃশ অশান্ত মনও শান্ত এবং সমাধিস্থ হয়ে যায়—একেবারে নির্বিষয় হয়ে যায়। মন খুব সূক্ষ্ম না হলে আধ্যাত্মিক ভাবের কি করে অনুভব হবে? আর একদিনেই কি মন নির্বিষয় হয়? কত সাধন-ভজন দরকার! মন যখন খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে যায় এবং একটা উচ্চ ভূমিতে থাকে তখনই ঐ-সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি হওয়া সম্ভব। মন শুদ্ধ হলেই সেই মনে আধ্যাত্মিক ভাব স্পন্দিত হবে। মন যতই উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হবে, ততই সেই মনে উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব প্রতিফলিত হয়। সারকথা হলো—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করা, তা হলেই সব হলো।

উতকামণ্ডে মহাপুরুষজীর শুভাগমনের সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইতেই মাদ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানের অনেক ভক্ত তাঁহার পূতসঙ্গ ও কৃপালাভমানসে ওখানে উপস্থিত হইতেছিলেন। কিছুদিন তাঁহার কাছে বাস করিয়া সকলেই নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আলোক পাইয়া পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরিয়া যাইতেন। মালাবার হইতে যে কয়েকদল ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাকণালাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাপুরুষজীর নিকট হইতে বিদায়াশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—ঠাকুরকে দর্শন করার সৌভাগ্য তো আমার হয় নি, আমার নিকট আপনিই ঠাকুর—আপনিই আমার পরমগতি।

মহাপুরুষজী তাহা শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন—অমন কথা বলতে আছে? সকলেরই পরমগতি তিনি—সেই প্রভু। ঠাকুরের কথায় পড়েছ তো? তিনি বলতেন—'সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিন্তু সমুদ্র নয়।' আমি তাঁর চরণাশ্রিত দাস মাত্র। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।

অর্থাৎ শ্রীভগবানই সকলের একমাত্র গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষক ও সুহৃৎ; তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, সকলের আধার এবং সংসারের অব্যয় মূল। সবই সেই ভগবান। তোমার পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় পেয়েছ, আর তাঁর একজন নগণ্য ভৃত্য তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করে দিয়েছে। ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত নবজীবনলাভে তুমি ধন্য হয়ে গেছ। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।

তিনটি জিনিস বাস্তবিকই দুর্লভ, ভগবানের কৃপাতেই তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা —মনুষ্যজন্ম, মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মহাপুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ গুরুর আশ্রয়লাভ। দৈবকৃপায় তুমি এই তিন দুর্লভ সম্পদেরই অধিকারী হয়েছ; এখন ডুবে যাও তাঁর প্রেমের সাগরে, অমর হয়ে যাবে।

বৈষ্ণব গ্রন্থে একটি অতি সুন্দর কথা আছে—'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হলো। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।' ভগবানের কৃপা হলো, গুরুকৃপা হলো, আর বৈষ্ণব মানে যিনি বিষ্ণুকে জেনেছেন তাদৃশ পরম ভক্তের কৃপাও হলো, কিন্তু একের দয়া অর্থাৎ নিজের চেষ্টার অভাবে সবই বৃথা হলো—জীব মুক্ত হতে পারলে না। তোমার জীবনেও সবরকম যোগাযোগ হয়েছে। এখন যা পেয়েছ তা নিয়ে সাধন-ভজনে ডুবে যাও, অমৃতত্ব লাভ কর—অমর হয়ে যাও। এই জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকায় আর পড়তে হবে না।

ভক্ত—আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে সাধন-ভজনে ডুবে যেতে পারি, আর এ সংসারজালে যেন বদ্ধ না হই।

মহাপুরুষজী—আশীর্বাদ করছি বলেই তো তোমায় এত বলছি। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—তোমার সমগ্র মনপ্রাণ শ্রীগুরুমহারাজের চরণধ্যানে মগ্ন হয়ে যাক। আমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই, বাবা। কেউ ভগবান লাভ করতে চায়, এমন কি সেদিকে এগুবার চেষ্টা করছে দেখলেও আমাদের প্রাণে যে কত আনন্দ হয় তা আর কি বলব! যারা ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় এবং সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, তারা আমাদের পরম প্রিয়। ঠাকুর এসেছিলেন জীবকে মুক্তি দেবার জন্য। আমরাও তাঁর চরণাশ্রিত

দাস, যুগে যুগে তাঁরই ভৃত্য। জীবকে ভগবন্মুখী করা, তাঁর দিকে এগুবার সাহায্য করা, এই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সেজন্যই ঠাকুর আমাদের সঙ্গে করে এনেছেন এবং এখনো জগতে রেখেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরাও লোককে তাই শেখাব—কি করে ভগবানলাভ হয়।

এ সংসার অনিত্য, দুদিনকার। কী বিড়ম্বনা! অথচ এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে, অনিত্য সংসারের ক্ষণিক সুখে মত্ত হয়ে মানুষ জীবনের লক্ষ্য একেবারে ভুলে থাকে। এমনই ভুবনমোহিনী মায়ার খেলা! দেখ, বাবা, তুমি এখনো যুবক, তোমার মনে প্রভুর কৃপায় সংসারের ছাপ এখনো পড়ে নি। তোমায় সারকথা বলছি, যা আমাদের প্রাণের কথা। ত্যাগ ছাড়া কিছুই হবে না। তাই তো উপনিষদ্ বলছে —'ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ'। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। যোগ আর ভোগ একসঙ্গে হয় না। সংসারের ভোগসুখ না ছাড়লে সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাওয়া অসম্ভব। আর এই সংসার যে কি তা ঠাকুর খুব সরল কথায় বলে গেছেন—কামিনী আর কাঞ্চন এই হলো সংসার। শুধু বাহ্যিক ত্যাগ করলে হবে না; মন থেকে কাম-কাঞ্চন-ভোগের আসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। তুলসীদাসও বলেছেন —'জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।'—যেখানে কাম সেখানে রাম নেই অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করতে হলে জাগতিক সব ভোগবাসনা ছাড়তে হবে।

## শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই

৪ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৩ (১৮ জানুয়ারি, ১৯২৭)

স্থানীয় সাধু-ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে আজ কয়েক দিন হইল মহাপুরুষ মহারাজ মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত। নিত্যই কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও ভজন-কীর্তনাদি হইতেছে! যেন আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। ইতোপূর্বে ১৯২৪ সালে মহাপুরুষ মহারাজ আর একবার বোম্বাই আসিয়াছিলেন। তখন আশ্রম ভাড়াটে বাড়িতে ছিল। সেই বৎসরই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া নূতন জমিতে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। দুই বৎসরের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও বাড়িঘর ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন মহাপুরুষ মহারাজ সেই আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন।

মাঘ মাস। শীত পড়িয়াছে। একটু বেলায় বেশ রোদ উঠিলে মহাপুরুষ মহারাজ বেড়াইতে বাহির হন ও সমুদ্রের দিকে জুহু প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসেন। কোন দিন বা সমুদ্রের ধারে জেলেদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরও দর্শন করিতে যান। জেলেপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা 'বুড়ো' বাবাকে লইয়া খুব আনন্দ করে। তাহাদের কী ভক্তি!

আজ সকালে মহাপুরুষ মহারাজ নিজঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে লক্ষ্য

করিয়া বাহিরের দুই-একটি প্রতিষ্ঠানের কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—বাবা, ওসব ব্যাপার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এসব দেখলে শুনলে তবে তো লোক কোন্‌টি খাঁটি সত্য, তা বুঝতে পারবে। যারা ঠিক ঠিক সত্যান্বেষী, তারা সত্যকেই ধরে থাকবে। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' (সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, অসত্যের নয়)। সত্যেরই জয় হবে। আর যা অসত্য বা মেকি তা সত্যের হাওয়ায় উড়ে যাবে। এটা ঠিক জানবে যে যারা আন্তরিকভাবে সত্যবস্তু লাভ করতে চায়, তাদের ভগবান ঠিক সত্যপথে নিয়ে যাবেন। তাদের কোন ভয় নেই।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, মহারাজ, আপনারা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন আপনাদের তাঁকে কি বলে মনে হতো?

মহারাজ—আমরা যখন তাঁর কাছে যেতাম, তখন তিনি অবতার কি না, এসব ভাবনাই কখনো মনে আসত না, বা তিনি যে সমগ্র জগতে এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবেন, তাও আমরা ধারণা করতে পারি নি। কে জানে বাবা তখন যে, ঐ চৌদ্দ-পোয়া মানুষটিকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় এমন মাতামাতি হবে? তিনি আমাদের ভালবাসতেন—সেই ভালবাসার টানেই আমরা তাঁর কাছে যেতাম। ঠাকুরের ভালবাসার কথা আর কি বলব? সে এক অনির্বচনীয় ভালবাসা! ছেলেবেলাতে তো কেবল মা বাপের ভালবাসাই জানতুম এবং সে ভালবাসার চেয়ে আর বেশি যে কিছু থাকতে পারে, তারই ধারণা ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর ভালবাসা যখন পেলুম, তখন মা বাপের ভালবাসা অতি তুচ্ছ, মহা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলো। তাঁর কাছে এসে মনে হতো, যেন ঠিক আপন জায়গায় এসে পৌঁছেছি—এতদিন যেন অপরের স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আমার তো ঠাকুরের কাছে এলে ঠিক এমনি মনে হতো। অন্যের কি মনে হতো জানি নে।

ঠাকুরও আমায় প্রথম দর্শন থেকেই খুব আপনার করে নিয়েছিলেন। একদিন বললেন—'দেখ্, এখানে কত লোক আসে, কিন্তু কার বাড়ি কোথায় বা কার ছেলে, এসব কথা আমি কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নে, জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক, আর তোর বাড়ি কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবর জানতেও ইচ্ছা হচ্ছে। কেন বল্ তো? আচ্ছা, তোর বাড়ি কোথায়? আর তোর বাবার নামই বা কি?' আমি বললুম যে আমার বাড়ি বারাসতে, আর বাবার নাম রামকানাই ঘোষাল। এই শুনে ঠাকুর বললেন, 'বটে, তুই রামকানাই ঘোষালের ছেলে? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। তোর বাবাকে যে আমি খুব জানি। তিনি রানী রাসমণির বাড়ির মোক্তার ছিলেন। এঁরা তাঁকে খুব খাতির-যত্ন ও শ্রদ্ধা করেন, এখানে এলে আলাদা থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত, চাকর-বাকর, লোকজন সব ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি যে ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান করে লাল চেলির কাপড় পরে যখন মায়ের মন্দিরে আসতেন, তখন মনে হতো যেন সাক্ষাৎ ভৈরব—যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা সর্বদা লাল হয়েই

থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত। সে পেছনে বসে দেহতত্ত্ব ও শ্যামাবিষয়ক নানা গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ একেবারে লাল হয়ে যেত, তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হতো। আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বললাম—'হ্যাঁগা, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি। একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? দেখ (গা দেখিয়ে), এমন গাত্রদাহ যে লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনো কখনো বড় অসহ্য হয়। তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য, ঐ কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল! তাঁকে একবার আসতে বলিস তো।'

আমি তখন কলকাতায় থাকতুম, মাঝে মাঝে বাড়ি যেতুম। বাবাকে ঠাকুরের কথা বলায় তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং একবার এসে দেখাও করেছিলেন। ঠাকুর আব একদিন বলেছিলেন, 'তোর বাবার সাধন সকাম ছিল, সেই সাধনবলেই এত অর্থসমাগম হয় এবং এত সদ্ব্যয়ও করেছিলেন।'[১]

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার বাল্যকালের কথায় বলেন—আমি তখন খুবই ছেলেমানুষ ছিলুম। বিশেষ কিছুই স্মরণ নেই। তবে এটা বেশ মনে আছে যে, বাবা অনেক লোককে খেতে দিতেন। আমার মা সকলকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। তিনি লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। তখন তো বাবা অনায়াসে দু-পাঁচ জন বামুন চাকর রাখতে পারতেন, কিন্তু মা তা করতে দিতেন না। তিনি নিজের হাতে প্রায় সব কাজকর্ম করতেন। মা খুব লক্ষ্মী ছিলেন—খুব সাদাসিদেভাবে থাকতেন। মার খাটুনি দেখে বাবা অনেক সময় দুঃখ করতেন। তাতে মা বলতেন—'এদের সকলকে খাওয়ানো তো আমার মহাভাগ্যের কথা। এরা সব আমার ছেলে।' আমার বয়স যখন ন-বছর তখন আমার মা মারা যান। তিনি লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরতেন। এছাড়া অন্য বিশেষ কিছু তেমন মনে নেই। খুড়ো মশাই বলতেন যে মা কোনদিন কিছুই চাইতেন না, এমন কি নিজের কাপড়খানাও না।

---

১ পরে যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে যান, তখন ঘোষাল মহাশয়কে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হন এবং ভাবস্থ হইয়া একখানি পা তাঁহার ঘাড়ে তুলিয়া দেন। সেই অবস্থায় নাকি তিনি পূর্ববৎ আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাহাতে বলেন, 'মার ইচ্ছা হলে তাই হবে।'

সাধুসজ্জনের সেবা, দুঃস্থ অসহায়কে অকাতরে সাহায্য এবং সর্বোপরি দরিদ্র ছাত্রগণের ভরণপোষণ ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ঘোষাল মহাশয় তাঁহার উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। কখন কখনও তিনি কুড়ি-পঁচিশটি ছাত্রকে নিজ বাড়িতে রাখিয়া ও আহারাদি দিয়া স্কুলে পড়াইতেন। পরে ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার আয় কমিয়া যায়। তখন আর পূর্ববৎ অকাতরে দান-ধ্যান করিতে পারিতেন না। তিনি এইজন্য বিশেষ ব্যথিত ছিলেন। পরে তিনি নাকি কুচবিহার স্টেটের সহকারী দেওয়ানও হইয়াছিলেন।

এদিকে ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করতে করতে ক্রমে যখন সংসারের সব সংস্রব ছেড়ে দেব সংকল্প করলুম, তখন বাবার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে যাই। বাবাকে নিজ অভিপ্রায় জানাতে তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন, ধারা বয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। ঠাকুরঘর ছিল। আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বললেন। পরে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—'তোমার ভগবানলাভ হোক। আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি, সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। তাই তোমায় আশীর্বাদ করছি যে তোমার ভগবানলাভ হোক।' আমি একথা ঠাকুরকে এসে বলেছিলুম। তিনি শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—'খুব ভাল হয়েছে।'

সন্ন্যাসী—আজকালকার দিনে এরকম বাপ অতি বিরল—নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মহারাজ—হাঁ, তা বই কি। আমার বাবার সাধন-ভজন কিছু ছিল কিনা, তাই। আবার নিজে চেষ্টা করেও পান নি, অথচ প্রাণে সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। এদিকে সংসারের নানা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট লাভ করেছিলেন। তাই তিনি অত সহজেই আমায় বিদায় দিতে পেরেছিলেন।

অন্যদিন মহাপুরুষ মহারাজ রাত্রে আহারে বসিয়াছেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আহারাদির প্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, ঠাকুরের হাত নাকি খুব নরম ছিল—এত নরম যে লুচি ছিঁড়তে হাত কেটে গিয়েছিল?

মহারাজ—হাঁ, তাঁর হাত খুবই নরম ছিল। হাত কেন, তাঁর সর্বাঙ্গই খুব কোমল ছিল। একরকম কড়া লুচি হয় না? একদিন তাই ছিঁড়তে গিয়ে তাঁর নাকি হাত কেটে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে কতটুকু করিয়া আহার করিতেন জিজ্ঞাসা করায় মহাপুরুষ মহারাজ নিজের থালার প্রসাদী লুচি দেখাইয়া বলিলেন—আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তাঁর আহার খুবই সামান্য ছিল। এমনি একখানা, কি বড় জোর দুখানা ছোট লুচি ছিল তাঁর রাত্রের আহার। তার সঙ্গে একটু সুজির পায়স। খাঁটি দুধ হজম হতো না বলে, দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে অল্প সুজি ফেলে, তাই জ্বাল দিয়ে পায়সের মতো করে দেওয়া হতো। সেই পায়সই একটু খেতেন। তবে মাঝে মাঝে ক্ষিদে পেলে প্রায়ই একটু-আধটু কিছু না কিছু খেতেন। শিকেতে সন্দেশ ইত্যাদি তোলা থাকত। ক্ষিদে পেলে তাই থেকে একটি-দুটি সন্দেশ খেতেন। কখনো বা একটি সন্দেশের আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা তখন সামনে যে থাকত, তাকে দিয়ে দিতেন। তাঁর সবই ছেলেমানুষের মতো ছিল—ঠিক যেন একটি ছেলেমানুষ।

আহারান্তে মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তখন জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় তো আপনি, স্বামীজী ও কালী মহারাজ ঠাকুরকে না জানিয়ে লুকিয়ে বুদ্ধগয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পরে ঠাকুর আপনাদের কিছু বলেছিলেন কি?

মহারাজ—হাঁ, বলেছিলেন বই কি। হাতের একটি আঙুল ঘুরিয়ে পরে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন—'কোথাও কিছু নেই।' পরে নিজের শরীর দেখিয়ে বললেন—'এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাও না কেন, কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা' ইত্যাদি।

## শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই

১৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩ (২৭ জানুয়ারি, ১৯২৭)

রাত্রে আহারান্তে মহাপুরুষ মহারাজ বসিয়া আছেন। আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা অনেকেই তথায় উপস্থিত; এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, ঠাকুর নাকি বলতেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আপনারা তাঁকে কখনো একথা বলতে শুনেছেন? মহাপুরুষ মহারাজ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—একথা তো বইয়েই আছে।

সন্ন্যাসী—ঠাকুরের ও-কথার অর্থ কি? ওতে কি কেবল যারা ঠাকুরকে দর্শন করেছে এবং তাঁর কৃপায় ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করেছে তাদের কথাই বোঝাচ্ছে, না যারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সকলেরই শেষ জন্ম?

মহারাজ—তাঁর কথায় সকলকেই বোঝাচ্ছে। যারাই তাঁর উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তা তাঁকে দর্শন করেই হোক, আর যে করেই হোক, যারা তাঁকে আন্তরিক ভক্তি করে, ভগবানজ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাঁতে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদেরই শেষ জন্ম, তারাই মুক্ত হবে। তবে আত্মসমর্পণ চাই।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করে এখানে এসেছে তারাও মুক্ত হবে?

মহারাজ—হাঁ, তা বই কি। যারা শ্রীভগবানজ্ঞানে তাঁর শ্রীচরণে অনন্য শরণ নিয়েছে তাদের শেষ জন্ম। তবে ঠিক ঠিক মুক্ত হতে গেলে ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন চাই। এখানে আসা, সেই কি কম সৌভাগ্যের কথা?

সন্ন্যাসী—কই, আমরা তো কিছু করতে পারছি বলে মনে হয় না, আর কিছু হচ্ছে বলেও তো বুঝতে পারি নে?

মহারাজ—বাবা, যা এতদিন করে এসেছ, এখনো যা করছ, এও কি কম? তাঁর কৃপা না হলে এও সম্ভব হতো না। তোমাদের উপর কত কৃপা তাঁর! নইলে মা-বাপের কোল থেকে বাড়িঘর ছাড়িয়ে এনেছেন কেন? তোমাদের কৃপা করবেন, মানবজীবন ধন্য করবেন বলেই তো তিনি তোমাদের এখানে এনেছেন।

সন্ন্যাসী—কিন্তু মহারাজ, এই যেসব কাজকর্ম করছি, এতে ত্যাগ-বৈরাগ্য বাড়ছে বলে তো মনেই হয় না।

মহারাজ—এখানে যা কিছু করছ সবই তাঁর কাজ। শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই সব করছ। তোমাদের এতে নিজেদের কোন ভোগবাসনা নেই। এই যা করছ তাতেই ত্যাগ-বৈরাগ্য বাড়বে। খালি হৃষীকেশে ভিক্ষে করে খেলেই বুঝি মনে করছ বৈরাগ্য হবে! shame (ছিঃ)! এখন যা করছ তাই ঠিক। আপাতত সেই consciousness (জ্ঞান) সর্বদা না থাকতে পারে, কিন্তু ক্রমে দেখবে যে সেই জ্ঞান, সেই বুদ্ধিই পাকা হবে। সবই তাঁর। তোমাদের নিজেদের বলতে আর কিছুই থাকবে না।

সন্ন্যাসী—সেই অবস্থা হচ্ছে কোথায় মহারাজ? গভীর ধ্যানে 'অহং' একেবারে নাশ না হয়ে গেলে শান্তি কোথায়? আমাদের তো ধ্যানটি পর্যন্ত ভাল হয় না।

মহারাজ—সব হবে বাবা, ক্রমে ক্রমে সব হবে। আমি বলছি, বিশ্বাস কর।

## শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই

১৪ মাঘ, শুক্রবার, ১৩৩৩ (২৮ জানুয়ারি, ১৯২৭)

রাত্রে আহারাদির পর সাধু-ব্রহ্মচারীরা সকলেই মহাপুরুষজীর পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। মহাপুরুষজী ক্রমে স্বামীজীর সম্বন্ধে বলিতেছেন—এখানে স্বামীজী ছবিলদাসের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। এই সময়েই তিনি এ অঞ্চলের অনেক স্থান বেড়িয়েছিলেন। ছবিলদাস আর্যসমাজভুক্ত ছিলেন, তিনি সাকার উপাসনা মানতেন না। স্বামীজীর সঙ্গেও এ-বিষয়ে অনেক সময় তাঁর নানা বিচারাদি হতো। একদিন তিনি স্বামীজীকে বললেন—'আচ্ছা, আপনি তো বলছেন, সাকার উপাসনা, পুতুল-পূজা, এসব সত্যি। আচ্ছা, আমি বলছি, আপনি যদি বেদ থেকে প্রমাণাদি দিয়ে আমায় সাকারোপাসনা বা সাকার ভগবানের কথা বোঝাতে পারেন, তবে আমি আর্যসমাজ ছেড়ে দেব।' স্বামীজী তাতে খুব জোরের সঙ্গে বললেন, 'হাঁ, তা পারি বই কি, নিশ্চয়ই পারি' এবং তখন থেকে তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত বেদ হতে সাকার উপাসনাদির সম্বন্ধে নানা প্রমাণ দেখিয়ে ছবিলদাসকে হিন্দুধর্ম বোঝাতে থাকেন। স্বামীজীর তো অসাধারণ প্রতিভা! শেষটায় ছবিলদাস সাকারোপাসনা মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞা মতো আর্যসমাজ ত্যাগ করলেন।

এখান থেকে স্বামীজী ক্রমে পুণা ও মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। তিনি সচরাচর বড় একটা গাড়িতে চড়তেন না, কিন্তু চড়লে ফার্স্ট ক্লাসেই চড়তেন। কেউ টাকা পয়সা দিতে এলেও নিতেন না। তবে বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে বলতেন—'তা হলে একখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনে দাও।' তাঁর পেটের অসুখ ছিল কিনা, বার বার পায়খানায় যেতে হতো এবং দেরি সইত না। ফার্স্ট ক্লাসে এ বিষয়ে খুব সুবিধে। একবার তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে খুব সম্ভব লিমডীর রাজার ওখানে যাচ্ছেন। তিনি তো ফার্স্ট ক্লাসে সাধারণভাবে একটি গেঞ্জি গায়ে এক বেঞ্চিতে শুয়ে আছেন। সেই গাড়িতেই ওদিককার কয়েকজন বিশিষ্ট লোক উঠলেন। ফার্স্ট ক্লাসে ঐ বেশে এক সন্ন্যাসীকে একখানা বেঞ্চি দখল করে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁরা তো ভারি চটে গেলেন এবং ইংরেজিতে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলেন যে সন্ন্যাসীরাই ভারতবর্ষকে উৎসন্ন করেছে ইত্যাদি বলে নানাপ্রকার নিন্দা আরম্ভ করলেন। স্বামীজী দিব্যি শুয়ে আছেন এবং সব শুনে যাচ্ছেন। শেষটায় তাঁরা এত বাড়াবাড়ি শুরু করলেন যে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ধড়মড় করে উঠে বসেই তাঁদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন—'আপনারা কি বলছেন! সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষকে উৎসন্ন করেছে, না তারাই ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, এঁরা কি ছিলেন এবং ভারতের জন্য কি করেছেন, ভেবে দেখুন দেখি।' এইভাবে আরম্ভ করে তিনি ইতিহাস ধরে দেখালেন যে সন্ন্যাসীরাই ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁদের সকল কথার এমন সুন্দর উত্তর দিলেন যে তাঁরা তো অবাক। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ arguments (যুক্তি) শুনে আগন্তুকদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি এত চমৎকৃত হলেন যে শেষটায় স্বামীজীকে তাঁদের ওখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। অবশ্য স্বামীজী তখন তাঁর সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সমর্থ হন নি। কারণ, তিনি তখন যাচ্ছিলেন লিমডী রাজার guest (অতিথি) হয়ে। লিমডীর রাজা স্বামীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। স্বামীজী এক সময় পুণাতেও নেমেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনাকে 'মহাপুরুষ' নাম কে দিলেন?

মহারাজ—স্বামীজীই আমাকে 'মহাপুরুষ' বলে ডাকতেন।

সন্ন্যাসী—কেন? এর কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

মহারাজ—তা আছে। ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম, তখন আবার মাঝে মাঝে বাড়িও যেতে হতো। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল কিনা আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে নাক কান বুজে ভগবানের নাম করে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী অনেক কান্নাকাটা করত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব শুনে আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন—'ভয় কি? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি,

আর এই ক্রিয়া করবি, তোর কিছুই হবে না। যা, স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর বৈরাগ্য এতে আরো তীব্র হবে।'

রাখাল মহারাজকেও ঠাকুর ঐরকম একটা ক্রিয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ঠাকুরের আদেশানুযায়ী ক্রিয়াদি করায় আমার কোন কিছুরই উপদ্রব হয় নি। একথা স্বামীজীকে একদিন কথায় কথায় বলায় তিনি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন—'বলেন কি! এ যে মহাপুরুষের লক্ষণ! আপনি তো মহাপুরুষ।' তিনি তখন থেকে আমায় 'মহাপুরুষ' বলে ডাকতে আরম্ভ করেন এবং তখন থেকে সকলেই ঐ নামে ডাকে। আগে স্বামীজী আমায় 'তারকদা' বলে ডাকতেন। একদিন বলরাম-মন্দিরে স্বামীজী আমায় 'মহাপুরুষ' বলে ডাকছেন। তাই শুনে বাবুরাম মহারাজের মা বললেন—'সে কি গো! মহাপুরুষ তো গাছে থাকে। ইনি আবার কিরকম মহাপুরুষ?' তাই শুনে স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'এ সেরকম মহাপুরুষ নয়—ইনি হলেন ঠিক ঠিক মহাপুরুষ।' বাবুরাম মহারাজের মা তো সব শুনে ভারি খুশি।

## বোম্বাই

১৬ মাঘ, রবিবার, ১৩৩৩ (৩০ জানুয়ারি, ১৯২৭)

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আজ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্তন, ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে উৎসবের আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে।

সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট স্বামীজীর প্রসঙ্গ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া একসঙ্গে কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবা ও পরে বরানগরে মঠস্থাপনাদি ঘটনা সংক্ষেপে বলার পর জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, পরিব্রাজক অবস্থায় আপনি এবং স্বামীজী কখনো একসঙ্গে ছিলেন কি?

মহাপুরুষজী—হাঁ, কখনো কখনো স্বামীজীর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলাম বা ভ্রমণাদির সময় কোথাও কোথাও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছিল। একবার আমি ও কাশীর ব্রহ্মচারী হারাণ উত্তরাখণ্ডের তীর্থাদি-দর্শনমানসে বেরিয়েছিলাম। প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন যাবার পথে হাতরাস জংশনে নেমে শুনতে পেলাম যে, স্বামীজী ওখানে রয়েছেন এক রেলওয়ে কর্মচারীর বাসায়। তিনি তখন জ্বরে ভুগছিলেন। ঐ খবর পেয়েই আমরা স্বামীজীর সঙ্গে

দেখা করতে গেলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর ভারি আনন্দ। ঐ জ্বর গায়েই কত কথা—কত হাসি-তামাসা, রঙ্গ-রসিকতা ও আনন্দ যে করতে লাগলেন তা আর কি বলব! ওখানে ২।৩ দিন থাকার পরেই স্বামীজীর জ্বর ছেড়ে গেল; কিন্তু তাঁর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করে আসতে বললেন। বৃন্দাবন হতে ফিরে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সকলে হৃষীকেশ যাব স্থির হলো; ততদিনে তাঁর শরীরও সুস্থ সবল হয়ে উঠবে।

আমি ও হারাণ বৃন্দাবনদর্শনে গেলাম। সেখানে কয়েক দিন খুবই আনন্দে কাটল। বৃন্দাবন কি কম স্থান গা? স্বয়ং শ্রীভগবানের লীলাস্থল। ও-স্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়াই স্বতন্ত্র। বৃন্দাবন থেকে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডে গেলাম। পথে একস্থানে হারাণ ব্রহ্মচারী নিজের পুঁটলিটি রেখে শৌচাদিতে গিয়েছে, ইতোমধ্যে ঐ পুঁটলিটি চুরি হয়ে গেল। আমাদের দুজনের যা সামান্য টাকাকড়ি ছিল তা আমার কাছেই থাকত; কিন্তু হারাণ আবার একখানি দশ টাকার নোট তার পুঁটলির ভিতর আলাদা রেখে দিয়েছিল। তাই পুঁটলিটি চুরি হওয়ায় তার মহাদুঃখ। সে একেবারে মনমরা হয়ে গেল। স্বামীজীর সঙ্গে পরে দেখা হতে তিনি সব শুনে খুব হাসাহাসি ও আনন্দ করেছিলেন। বৃন্দাবনের সব দর্শনীয় স্থানাদি দেখে হাতরাসে ফিরে এসে দেখি যে, স্বামীজী ফের জ্বরে পড়েছেন—খুব বেশি টেম্পারেচার। আর ক্রমাগত জ্বরে ভুগে ভুগে তাঁর শরীরও অত্যন্ত দুর্বল ও কৃশ হয়ে গিয়েছে। তখন ওখানে আর না থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম—তিনিও তাতে রাজি হলেন। তদনুসারে সব খবর জানিয়ে কলকাতায় ও মঠে চিঠি লেখা গেল। এদিকে হাতরাসে সব রেলকর্মচারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোক অনেকেই স্বামীজীর খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন বেশ জমিয়ে নিতেন। যে একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করত সেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত—এমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব! তাঁরা কিছুতেই স্বামীজীকে ছেড়ে দিতে চান না। শেষটায় অনেক বুঝিয়ে তাঁদের রাজি করিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট হতে কিছু টাকা হাওলাত করে তাঁকে নিয়ে মঠের দিকে রওনা হলাম। তাতে হারাণ আমার উপর ভারি অসন্তুষ্ট হলো; তাকে নিয়ে কেন আমি হরিদ্বারে গেলাম না—এই তার দুঃখ। সে আমায় বলতে লাগল—'সাধু হয়েছেন তা এখনো এত মায়া কেন? স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে না গেলেই নয়? সাধুর অত মায়া থাকা ভাল নয়?' ইত্যাদি। আমি তখন তাকে বললুম—'আরে ভাই! তুমি তো জান, আমরা সাধু হয়েছি বটে, কারো উপর মায়া থাকা ঠিক নয় তাও সত্য; কিন্তু গুরুভাইদের উপর একটু মায়া আমাদের আছে এবং তা থাকবেও। এ আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা। তিনিই আমাদের গুরুভাইদের পরস্পরের মধ্যে এ টানটুকু রেখে দিয়েছেন। বিশেষত স্বামীজী হলেন আমাদের সকলকার মাথার মণি। তাঁর জন্য আমরা নিজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি নে। বুকের রক্ত দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে নিজেদের ধন্য

মনে করব। স্বামীজী যে কী জিনিস তা তুমি কি বুঝবে?' আমার কথা শুনে হারাণ চুপ করে রইল।

হাতরাসের ভক্তদের বলে হারাণের হৃষীকেশ যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। তারাই তাকে টিকেট করে হৃষীকেশের দিকে রওনা করে দিল।

স্বামীজীকে নিয়ে তো কলকাতার দিকে রওনা হলাম। এদিকে নিরঞ্জন স্বামী স্বামীজীর জ্বরের খবর পেয়ে অমনি মঠ হতে হাতরাসের দিকে রওনা হয়েছিলেন। আমরা বোধ হয় এলাহাবাদে দু গাড়িতে ক্রস্ (পাশ কেটে অতিক্রম) করি—কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না। পরে মঠে এসে ডাক্তার বিপিনবাবুকে দেখানো হলো। তাঁরই চিকিৎসাতে স্বামীজী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তারপর অনেক ঘোরাঘুরি করে স্বামীজী কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে করে হৃষীকেশে তপস্যায় গেলেন। দিনরাত কঠোর তপস্যা, ধ্যান-জপ ও বেদান্তচর্চা খুব চলেছিল। স্বামীজী বলতেন, যে, এমন আনন্দে কখনো থাকেন নি। তখন বর্ষাকাল। অন্যান্য সাধুরা বড় একটা কেউ ওখানে থাকতেন না। একমাত্র সত্রই সম্বল। সে সময় হৃষীকেশ বাস্তবিকই তপস্যার অনুকূল স্থান ছিল। এখন তো হৃষীকেশ ছোটখাট শহর হয়ে গেছে। কিছুকাল কঠোর তপস্যা ও বেদান্তচর্চায় খুব আনন্দে কাটাবার পরেই স্বামীজীর জ্বর হলো। হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি গুরুভাইরা স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। জ্বর ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। ওখানে তখন ডাক্তার কবিরাজও ছিল না। তাই সকলেই স্বামীজীর জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিন হঠাৎ এমন হয়েছিল যে, জ্বর খুব বাড়ার পরে ক্রমে কমতে কমতে স্বামীজীর সব শরীর একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে নাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল—শুধু মাথাটি একটু গরম ছিল। কথাবার্তা সব বন্ধ—বাঁচবার আর কোন আশা ছিল না। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সকাতরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'ঠাকুর, এ বিপদ হতে আমাদের উদ্ধার কর, নরেনকে ভাল করে দাও। যদি এঁকে নাও তো আমাদেরও রেখো না—আমাদেরও নিয়ে যাও।' সকলেই মহা বিপন্ন হয়ে পড়লেন, অথচ কিছু করবার ছিল না।

ভাইদের মধ্যে একজন গঙ্গায় গিয়েছিলেন, তখন একজন সাধু গঙ্গাতে স্নান করছিলেন। সাধুটি অতি প্রাচীন, ও-দেশীয় এবং বরাবর হৃষীকেশেই থাকতেন। তিনি সেই গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' গুরুভাইটি স্বামীজীর অবস্থার কথা সব বললেন। তখন সেই সাধুটি এসে স্বামীজীকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—'তোমরা কিছু ভেবো না। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, ঐ ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু দিয়ে মেড়ে এঁর জিবে লাগিয়ে দাও, দেখবে ইনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।' এই বলে নিজ কুঠিয়ায় গিয়ে ভস্মের মতো একটু ঔষধ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুপানাদি সব যোগাড় করে এনে যেমন যেমন ঐ সাধুটি বলেছিলেন সেভাবে

ঔষধ স্বামীজীর জিবে লাগিয়ে দেওয়া হলো। আশ্চর্য যে, ঐ ঔষধ খাওয়াবার অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীজীর শরীর গরম হতে লাগল এবং তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। তখন স্বামীজী সব ঘটনা শুনে ধীরে ধীরে বললেন—'কেন তোরা আমায় ঔষধ খাওয়াতে গেলি? আমি যে খুব আনন্দে ছিলাম।' স্বামীজী ক্রমে কতকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন; কিন্তু দারুণ বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার মধ্যে হৃষীকেশে আর থাকা কিছুতেই সঙ্গত নয় মনে করে স্থানান্তরে যাওয়াই স্থির হলো। কিন্তু স্বামীজীর শরীর তখনো এত দুর্বল যে, তিনি কিভাবে যে অন্যত্র যাবেন তাই হলো এক সমস্যা। সে সময় টিহিড়ি-গাড়োয়ালের রাজা কোন কাজে ঐ অঞ্চলে এসেছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাই রঘুনাথ শাস্ত্রী তখন টিহিড়ি-রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁকে সব ব্যাপার বলাতে তিনি হৃষীকেশ হতে হরিদ্বার পর্যন্ত গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। হরিদ্বারে দিন কতক কাটিয়ে স্বামীজী মিরাটে এলেন। সেখানেও গুরুভাইরা সব তাঁর সঙ্গে এসে জুটলেন। মিরাট বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। ওখানে কয়েক মাস থাকার পরে তাঁর শরীর বেশ সেরে গেল। তখন তিনি একদিন বলেছিলেন—'এবার আমার খুব একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। এখন থেকে আর গুরুভাইদের সঙ্গে থাকব না, একলা থাকব। আমার অসুখে তোমাদের কত বিব্রত হতে হয়েছে! কোথায় সব তপস্যা করতে গিয়েছিলে, তা না করে আমার সেবা করতেই সকলকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আবার তোমাদের কারো অসুখ করলে আমাকে তার চাইতেও বেশি করতে হবে। গুরুভাইদের ভালবাসাও এক রকম বন্ধন। এ বন্ধনও কাটাতে হবে।' তিনি করেছিলেনও তাই। তারপর থেকে আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একা একা সারা ভারত ঘুরেছিলেন—কেউ তাঁর কোন খোঁজ পায় নি।

অতঃপর জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—স্বামীজীর দেহত্যাগের সময় কি আপনি মঠে ছিলেন?

মহাপুরুষজী—না, তখন আমি মঠে ছিলাম না। তার আট-দশ দিন পূর্বে স্বামীজীই আমাকে অনেক করে বলে কাশীতে বেদান্তপ্রচারের কাজ শুরু করতে পাঠান। জুন মাসের শেষভাগে আমি কাশীতে ঐ কাজের জন্য যাই। স্বামীজী যখন শেষবার কাশীতে আসেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় ভিঙ্গার মহারাজা কাশীতে বেদান্তপ্রচারের একটি প্রতিষ্ঠান করবার জন্য স্বামীজীকে পাঁচশত টাকা দেন। উক্ত মহারাজা তাঁকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নিজরাজ্য ছেড়ে কাশীতে দুর্গাবাড়ির নিকট একটি বাগানবাড়ি তৈরি করে সেখানে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে থাকতেন, নিজের বাড়ির সীমানার বাইরে যেতেন না। স্বামীজী কাশীতে এসেছেন খবর পেয়ে একদিন জনৈক কর্মচারীর হাতে প্রচুর ফল মিষ্টান্নাদি পাঠিয়ে স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে পদধূলি দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠান এবং আরো বলে পাঠান যে, তিনি ব্রত নিয়েছেন—নিজ বাড়ির সীমানার বাইরে যাবেন না, সেজন্য স্বামীজীর শ্রীচরণে উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

মহারাজার ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী বললেন—'আমরা সাধু, যখন নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তখন কেন যাব না? নিশ্চয় যাব।' তিনি সেই মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁর বাড়িতে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মহারাজা খুব ভক্তিভাবে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'আমি আপনার কার্যাবলী অনেক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি এবং তাতে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করছি। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আপনাকে দেখলে মনে হয় বুদ্ধদেব, শঙ্কর প্রভৃতি অবতারপুরুষগণ যেমন ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জগতে এসেছিলেন, তেমনি আপনারও সেজন্য দেহধারণ। আপনার সংকল্প কার্যে পরিণত হোক, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।' সে-সময় কাশীতেও কিছু প্রচারকার্য যাতে হয় সেজন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করে তিনি পাঁচশত টাকা দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী তখন সে টাকা নিলেন না; বললেন যে, পরে এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মহারাজা পুনরায় স্বামীজীর নিকট পাঁচশত টাকা পাঠিয়ে দেন এবং কাশীতে কাজ আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। তখন স্বামীজী সেই টাকা গ্রহণ করেন।

মঠে ফিরে স্বামীজী প্রথম শরৎ মহারাজকে কাশীতে যাবার কথা বলেন। শরৎ মহারাজ তাতে রাজি হলেন না, বললেন—'কাশীতে আমার সুবিধে হবে না।' কাজেই তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ কাশী যাবার কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ, ডায়াবিটিস (বহুমূত্র) অত্যন্ত বেড়েছিল। আমি তাঁকে ঔষধ ইত্যাদি খাওয়াতাম এবং তাঁর সেবার তত্ত্বাবধান করতাম। তাই তখন তাঁর সেবা ছেড়ে গেলাম না; পরে তাঁর শরীর যখন অনেকটা সেরে উঠল তখন তিনি আমায় কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন।

জনৈক সন্ন্যাসী—কাশী সেবাশ্রমের কথা উল্লেখ করে মাস্টারমশাই বলতেন —শিবানন্দের ধ্যানে কাশী সেবাশ্রম কি রকম জেগে উঠেছে দেখ!

মহাপুরুষজী—সে কি কোন কথা? সবই তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কৃপায় হয়। ঠাকুরের ভাব দিন দিনই আরো বেশি প্রচার হবে। এ যুগধর্মের প্রভাব। দেখ না, বোম্বেতেই প্রথমটায় কি ছিল, এখন কত কি হচ্ছে! কালে আরো কত হবে! সব তাঁর লীলা।

পরে জনৈক পার্শী ভক্ত-মহিলার গানের কথায় তিনি বলিলেন—আহা, কি ভক্তির সহিত 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোঈ' এ গানটি গায়! এই বলিয়া তিনি নিজেই গানটি গাহিতে লাগিলেন।

## বেলুড় মঠ

২৭ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩৪ (১০ জুন, ১৯২৭)

বিকালবেলা। মহাপুরুষ মহারাজ মঠের পূর্বদিকের নিচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। সামনে কলিকাতার এক ব্যায়াম-সমিতির ছেলেরা নানাপ্রকার কসরত দেখাইতেছিল, তাহাই অতি আগ্রহ-সহকারে দেখিতেছেন। মঠের অন্যান্য সাধু এবং ভক্তগণও ঐ সকল ক্রীড়া খুব উপভোগ করিতেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ইতোমধ্যে জনৈক সন্ন্যাসীকে বাজার হইতে তাড়াতাড়ি কিছু মিষ্টান্নাদি আনিতে পাঠাইলেন। একটি ছেলের পেশী-নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—আহা, এ ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখিয়েছে। খুব কর, বাবা, আরো উন্নত হও। ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক পালন করতে হবে। এইসব দৈহিক কাজেও ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য পালনই হলো প্রত্যেক কাজের secret of success (সফলতার মূলমন্ত্র), তা তুমি যে রকমের কাজই কর না কেন। ব্রহ্মচর্যের অভাবেই দেশের যত অবনতি। তারপর ছেলেদের প্রসাদ ও মিষ্টান্নাদি পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া মহাপুরুষ মহারাজ উপরে গমন করিলেন।

নানাপ্রকার কসরত দেখিয়া ভারি খুশি হইয়াছেন, তাই নিকটস্থ কয়েকজন সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা exercise (ব্যায়াম) কর তো? তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জন 'হাঁ' বলায় মহাপুরুষজী পুনরায় বলিতেছেন—exercise নিত্য নিয়মিতভাবে করা উচিত। শাস্ত্রে আছে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্' (শরীরই ধর্মলাভের প্রথম উপায়)। ধর্মলাভ করবার জন্য প্রথমত শরীরকে খুব পটু করতে হবে। *Mens sana in corpore sano*—a sound mind in a sound body. সুস্থ শরীরেই সবল মন বাস করতে পারে। দেখ না, ঠাকুরের ছেলেদের সকলকার শরীর! স্বামীজী মহারাজ, নিরঞ্জন স্বামী, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলেই খুব ভাল athlete (পালোয়ান) ছিলেন। স্বামীজী, মহারাজ প্রভৃতি তো রীতিমতো সাগরেদি করে কুস্তি ও কসরত শিখেছিলেন। আমাদের মধ্যে কেবল যোগীন স্বামী ও বাবুরাম মহারাজের শরীর ওরই মধ্যে একটু খারাপ ছিল। শরীর ভাল না হলে অত কঠোরতা, অত সাধন-ভজন করবে কেমন করে? তোমরা সব youngmen (যুবক), তোমাদের রোজ exercise (ব্যায়াম) করা দরকার। তোমাদের তো পালোয়ান হতে হবে না, শরীর ভাল রাখার জন্য exercise (ব্যায়াম) করা। খালি সাধু হলে তো হবে না। উপনিষদে আছে, 'যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ' (যুবা হওয়া চাই—সৎপ্রকৃতি, অধ্যয়নশীল এবং বিশেষভাবে ক্ষিপ্রকর্মা, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ যুবা), ইত্যাদি। তবেই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারি হতে পারে। স্বামীজী যেমন বলতেন—'পিন্‌পিনে মিন্‌মিনে, সাত চড়ে কথা বলে না—তাদের কি বাপু কখনো ধর্ম হয়?' ঠিক কথা। শরীর রুগ্ন হলে দিনরাত তো দেহের সেবাতেই

অস্থির থাকতে হবে। ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন, পড়াশুনা বা কাজকর্ম করবে কখন? তা ছাড়া শরীর বেশ পটু না হলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির বেগ ধারণ করতে পারে না। হয়তো মাথা খারাপ হলো, কি শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। তা ছাড়া তোমরা, বাবা, ঠাকুর-স্বামীজীর পল্টন। তোমাদের কত কাজ করতে হবে দুনিয়াতে! যাদের শরীর বেশ ভাল দেখতেন, স্বামীজী তাদের খুব পছন্দ করতেন। স্বামীজীর নিজের অমন সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ ছিল বলেই তো তিনি এত অল্পদিনের মধ্যে সারা দুনিয়াটাকে একেবারে তোলপাড় করে দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষজী নিচে নামিয়া দক্ষিণদিকের মাঠের নিকট দাঁড়াইয়া গরুগুলিকে আদর করিতেছেন। আজ তাঁহার আদেশে উহাদিগকে গুড় ও ছাতু খাওয়ানো হইতেছিল। গরুগুলির আনন্দ দেখিয়া মহাপুরুষজী ভারি খুশি। তারপর মাঠে পাদচারণ করিতেছেন, সঙ্গে দুই-এক জন ভক্তও আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—দেখ, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব এ দুনিয়ায় সকলকে নিতে হবে। স্বামীজী এসেছিলেন ঠাকুরের সাম্যভাব প্রচারের জন্য। কালে দেখবে পাশ্চাত্য দেশগুলিও কেমন সে ভাব গ্রহণ করবে। এই তো সবে গোড়াপত্তন, সবেমাত্র শুরু। ওরা intellectual (বিচারশীল) জাত। এই উদারভাব ক্রমে দেখবে সকলেই নেবে, আর একমাত্র ঠাকুরের এই সমন্বয়ভাবই সমগ্র জগতে শান্তিস্থাপন করতে পারবে। বিভিন্ন দেশে নানাভাবে ঠাকুরের জীবনাদর্শ লোকে নিচ্ছে, আর ঠাকুর-স্বামীজীর কথাই নানা লোকে নানাভাবে নিজেদের নামের ছাপ মেরে চালাচ্ছে। তাই করুক না। তাঁরা তো আর নামযশের কাঙাল নন! তাঁরা এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। তা হলেই হলো। তাঁদের ভাবপ্রচার হলেই হলো। ঠাকুর মান চান নি। তিনি মান-যশ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, 'হ্যাক্ থু থু' করতেন। দেখ নাম-যশ হজম করা বড় শক্ত ব্যাপার। যারা আত্মসাক্ষাৎকার করে নি, তারা কিছুতেই মানযশের আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারে না। এই দেখ না, আজকাল কত কত অবতার বেরুচ্ছে! একটু ভক্তিবিশ্বাস হলো, একটু ভাবটাব হলো আর অমনি অবতার! ব্যস, ঐখানেই শেষ। অহংকার, অভিমান হওয়ার ফলে ধর্মরাজ্যে আর এগুতে পারে না। বরং যা ছিল, তাও নষ্ট হয়ে যায়।

## বেলুড় মঠ

৩ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৪ (১৮ জুন, ১৯২৭)

বেলা আন্দাজ পাঁচটা হইবে। মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। নিকটে কয়েকজন ভক্ত। একটি চার বৎসরের বালক অতি সুন্দর তবলা বাজাইতে পারে; সেই কথা উঠিলে মহাপুরুষজী বলিলেন—এসব দেখে জন্মান্তরে বিশ্বাস না করে পারা

হয় না! পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে কি আর এত অল্প বয়সে এমন হওয়া সম্ভব? একে কে শিখিয়েছে বাজনা, অথচ এমন সুন্দর তাল-লয়ের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছে!

সন্ধ্যারতির পর রামনাম-সংকীর্তন হইতেছে। মঠের সাধুবৃন্দ ও বহু ভক্ত উহাতে যোগদান করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজও নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্নচিত্তে কীর্তন শুনিতেছেন। ক্রমে রামনাম ও ভজনাদি শেষ হইয়া গেল। ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব গৃহে ফিরিবার পূর্বে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—এ রামনাম-কীর্তন মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দক্ষিণদেশে গিয়ে প্রথম শোনেন। শুনে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, তাই তিনি মঠের ছেলেদের এ রামনাম শেখান। এখন তো মঠে প্রত্যেক একাদশীতে রামনাম গান হয়। আর দেখতে দেখতে এই রামনাম সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। কত লোক আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছে! স্বামীজীর প্রাণের বড় ইচ্ছা ছিল যে, ভারতের ঘরে ঘরে মহাবীরের পুজো হয়। মহাবীর অকুমার ব্রহ্মচারী। মহাবীরের পুজো দেশে হলে তবে তো লোকের ভিতর আত্মশক্তি জেগে উঠবে।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ এবার আহারে বসিবেন। জনৈক ভক্ত জাতিবিচারের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—মহারাজ, কেউ কেউ স্বামীজীর নামে দোষারোপ করে যে তিনি মঠে ঠাকুরের উৎসবে সকলকে একত্রে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে দেশের লোকের জাত মেরে দিচ্ছেন।

ইহা শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—দেখ, কি বুদ্ধি সব! এখানে যে উৎসব হয় তাতে ব্রাহ্মণ দিয়ে রান্না করানো হয়, তারপর ঠাকুরের ভোগ হয়। এই যে শত শত মণ খিচুড়ি, তরকারি ইত্যাদি রান্না হয়, সবই তো বিরাট ভোগ দিয়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করা হয়, এবং ঐ প্রসাদই সকলে পেয়ে থাকে। আর লোক তো ইচ্ছে করে প্রসাদ পেতে বসে। আমরা কখনো কাউকে বলি নে যে তোমরা একত্রে বসে খাও। তা কখনো বলি নে। এতেও যদি কেউ বলে তো বলুক, তার আর কি করা যাবে বল। এমন গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণের রান্না করা শ্রীভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ, তাতেও আপত্তি? বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। জাত আর আছে কোথা? শাস্ত্রে আছে যে বার বছর শূদ্রের দাসত্ব করলে শূদ্রত্ব এসে যায়। অনেকে তো দেখছি, বাবা, বার বছর কেন, চব্বিশ বছর ম্লেচ্ছের দাসত্ব করছে। তাতেও জাতের বড়াই! নিজেরা কিছু করবে না, কেবল জাত নিয়ে চেঁচামেচি। কোথায় সেই যাগযজ্ঞাদি, দানধ্যান, ত্যাগ-তপস্যা? তাই তো স্বামীজী খুব দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তোদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে ঢুকেছে—সব ছুঁৎমার্গীর দল।'

## বেলুড় মঠ

### ২৫ আষাঢ়, রবিবার, ১৩৩৪ (১০ জুলাই, ১৯২৭)

আজ রবিবার। মহাপুরুষজীর ঘরে ভক্তদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। বরিশাল হইতে আগত উপদেশপ্রার্থী একদল ভক্তনরনারীও উপস্থিত আছেন। জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া বলিলেন—মহারাজ, আমাদিগকে একটু উপদেশ দিন। আমরা সংসারী জীব, দিনরাতই জ্বলেপুড়ে মরছি। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পাই জীবনে।

মহাপুরুষজী বৃদ্ধটির আগ্রহ দেখিয়া করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন—উপদেশ আর কি দেব, বাবা? আমাদের এক উপদেশ—তাঁকে যেন ভুল না হয়। এই তো সার কথা। আমরা নিজেরাও এইটি পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, আর অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলেও এই বলি—শ্রীভগবানকে যেন ভুলো না। তোমরা সংসারে রয়েছ, বেশ তো। সংসার ছাড়া আর কে আছে বল? কিন্তু তাঁকে ভুলে থেকো না। সংসারের সব কর্তব্যকর্ম করবে, কিন্তু তারই মধ্যে দিনান্তে অন্তত একটিবারও তাঁকে প্রাণের সহিত ডাকতে হবে। সংসারের কাজকর্ম তো আছেই, তা তো ছাড়তে বলছি নে; কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর স্মরণ-মনন, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁর নামজপ, এসব করবে। বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে, 'হাতে কাজ মুখে হরিনাম।' এ ভারি সুন্দর কথা। সব কাজের ভিতরই তাঁর নামগুণগান করা। প্রত্যেক কাজের যেমন একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি ভগবানকে ডাকবারও সময় নির্দিষ্ট রাখবে। সেই সময় শতকাজের মধ্যেও তাঁর স্মরণ-মনন করতে হবে। আর যতটুকুই ডাকবে, আন্তরিকভাবে করা চাই! তিনি অন্তর্যামী, তিনি দেখেন প্রাণ। এ অতি গুহ্য কথা। সংসারে একটু শান্তিতে থাকবার এই একমাত্র উপায়। এটি যদি ভুল হয়, তবে গোলমালের সম্ভাবনা।

জনৈক স্ত্রীভক্ত—কেন আমরা ভগবানকে ভুলে থাকি, মহারাজ? কেন আমাদের মন তাঁর দিকে যায় না?

মহারাজ—কেন ভুলে থাক, মা? এরই নাম মায়া, মায়াতে বদ্ধ হয়ে রয়েছ, তাই তাঁকে ভুলে থাক, তাই তোমাদের মন শ্রীভগবানকে ভুলে অনিত্য বিষয়ে লিপ্ত হয়ে থাকে। বিষয়কে যেমন ভালবাস, ভগবানকে কি তেমনি ভালবাস? এই সংসার যে দু-দিনের, আর তোমার দেহ, আত্মীয়-স্বজন, যাকে 'আমি আমার' করে পাগল, তাও যে অনিত্য তা কি আর বলে বুঝাতে হবে? দেখছই তো দিবারাত্র চোখের সামনে—আজ আছে, কাল নেই; এখন রয়েছে, পরমুহূর্তে নেই; হলো, আবার মলো; এই সুখ, আবার দু-দিন পরেই দুঃখ। অথচ এই নিয়েই তো মজে রয়েছ?

স্ত্রীভক্ত—আমাদের, বাবা, কি করে উদ্ধার হবে? কি করে এ মায়া থেকে মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।

মহারাজ—এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়া এ মায়াজাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই, মা! শ্রীভগবান নিজেই গীতাতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।'

—'এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত করে রেখেছে, তা বাস্তবিকই দুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বাস্তবিকই সুকঠিন, কিন্তু যারা অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে তারা এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।' অনন্যমনে তাঁকে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তোমরা সংসারে রয়েছ, নানা কাজকর্ম আছে, তোমাদের তো সাধন-ভজন করবার মতো সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা কর, 'প্রভু দয়া কর, দয়া কর।' কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। তখন তিনি সহস্রসূর্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন। তখন দেখবে যে তিনি অন্তরেই রয়েছেন। খুব কাঁদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার করবে। একমাত্র ভগবানই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, সবই অনিত্য। এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে তাঁর দয়া হবে, সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের দিকে যাবে।

স্ত্রীভক্ত—আপনি, বাবা, একটু আশীর্বাদ করুন। আপনাদের দয়াতে যেন এ সংসার-সাগর পার হয়ে যেতে পারি।

মহারাজ—আমাদের তো মা, আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। লোক এ সংসার-সাগরের পারে চলে যাক, এই তো আমাদের প্রাণের ইচ্ছা। আমরা তো তাই চাই। আমি প্রাণ খুলে প্রার্থনা করছি, তোমার শ্রীভগবানে অনুরাগ হোক। কি আর বলব, মা!

ভক্তগণ পরিপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক সেবক দৈনিক ডাকের চিঠি পড়িয়া শুনাইতেছেন। একজন ভক্ত মহাপুরুষজীর কোনপ্রকার সেবাদি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া প্রাণের দুঃখ জানাইয়া লিখিয়াছেন।

এই চিঠি শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—ওকে জবাবে খুব আশীর্বাদ করে লিখে দিও যে আমার আর কি সেবা করবে? ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের কোনরূপ অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। আমার কোন সেবাই করতে হবে না। বরং সে যদি ঠাকুরকে আন্তরিকভাবে একটু একটু ডাকে তা হলেই আমি খুব সুখী হব। তাতেই আমার আনন্দ হবে।

## বেলুড় মঠ

### ১৭ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৪ (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মাতৃস্থানীয় পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দজী আজ কয়েক দিন হইল শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। মঠের সাধুবৃন্দ ও ভক্তগণ সকলেই শোকে মুহ্যমান; বিশেষ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ শরৎ মহারাজের apoplexy (সন্ন্যাসরোগ) হওয়ার সংবাদ পাওয়া অবধি অসম্ভব শোকাকুল ও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা মহাদুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সদা আনমনা হইয়া থাকিতেন, কখনো দেখা যাইত যে তিনি নীরবে অশ্রুজল মোচন করিতেছেন, আর কেবল ব্যস্তভাবে শরৎ মহারাজের সংবাদ লইতেন। কেহ দীক্ষাদি বা অন্য ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে খুব শান্তভাবে বলিতেন—এখন ওসব কিছু হবে না, আমার মন বড় খারাপ। শরৎ মহারাজের অসুখ। কথাবার্তা যাহা বলিতেন, বেশির ভাগই শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে। বেলুড় মঠে শরৎ মহারাজের পূত দেহের সৎকারের কিছু পূর্বে মহাপুরুষজী একটিবার মাত্র আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন—শরৎ মহারাজ গঙ্গাস্নান বড় ভালবাসতেন। তোমরা তাঁকে বেশ ভাল করে গঙ্গাস্নান করিও।

আজ শনিবার। বিকালবেলা মহাপুরুষজীর ঘরে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। মহাপুরুষজী নিজে যদিও শোকসন্তপ্ত, কিন্তু সকলকেই কুশলপ্রশ্ন ও আশীর্বাদাদি করিতেছেন। দু-চার কথার পরই শরৎ মহারাজের কথা উঠিল। মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা, যে শনিবারে শরৎ মহারাজের অসুখ হলো তার আগের সোমবার দিন তিনি মঠে এসেছিলেন। সেদিন গভর্ণিং বডির মিটিং ছিল। আমায় বললেন—'দেখুন, শরীরটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় আর বেশি দিন টিকবে না।' কিন্তু তখন তো আমার মনে হয় নি যে এত শিগ্‌গির তিনি চলে যাবেন। তিনি মহা ভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর উপর শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা ছিল। তাই তিনি একেবারে ডঙ্কা মেরে চলে গেলেন। সারা জীবন যেমন লোককল্যাণ করেছেন—বহু লোকের জীবন তৈরি ও বহু লোককে উদ্ধার করেছেন—তেমনি শেষ কয়দিন এইভাবে অসুস্থ শরীরে থেকে বহু লোকের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। অমনি তো তিনি কাউকে সেবাদি কিছু করতে দিতেন না, কিন্তু শেষ কয়দিন ছেলেরা কি সেবাটাই না করেছে! বার বছর সাধন-ভজন ও তপস্যাদি করে যা না হতো, তা এ কয়দিনের সেবায় এদের হয়েছে। কেবল ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই যেন তিনি এ কয়দিন ওভাবে ছিলেন। কত লোক কত জায়গা থেকে এল, কত সেবাদি করলে, দর্শন করলে! কারো কোন ক্ষোভ রেখে যাননি তিনি। সকলকেই সাধ মিটিয়ে সেবাদি করবার সুযোগ দিয়েছেন।

তিনি তো মহাযোগী, সমাধিতে দেহত্যাগ করে একেবারে ঠাকুর ও মার নিকট চলে গেলেন। তাঁর আর কি—যেভাবেই শরীর যাক না কেন। শাস্ত্রেও আছে ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষ মূর্ছিত, লুণ্ঠিত বা যেভাবেই শরীরত্যাগ করুন না কেন, তাতে তাঁদের জ্ঞানের কোন হানি হয় না। প্রথম attack-এর (আক্রমণের) পর থেকে এ কয়দিন তাঁর বাইরের তেমন হুঁশ ছিল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুরোপুরি জ্ঞান ছিল। আমি একদিন মাত্র দেখতে গিয়েছিলুম। ও দৃশ্য আমার আর দেখতে ইচ্ছা হতো না, তাই আর যাই নি। গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) 'দাদা, দাদা' বলে ডাকতেই চোখ মেলে চেয়েছিলেন—পরে আবার চোখ বোজেন। বিপিন ডাক্তারও 'শরৎ, শরৎ' বলে ডাকতে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। বিপিনবাবু বললেন—'শরৎ, চা খাবি?' তাতে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা জানালেন। পরে ঠাকুরের চরণামৃতের কথা জিজ্ঞেস করায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ঠাকুরের চরণামৃত দেওয়া হয়েছিল; তা খেলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মহাপুরুষজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—বিশেষ করে শেষ কয়েক বৎসর শরৎ মহারাজ খুব কঠিন সাধন-ভজন করতে শুরু করেছিলেন। প্রাতে গঙ্গাস্নানাদি করে ধ্যান-জপ করতে বসতেন, একাসনে বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত বসে আছেন। মাঝে একটিবার কেবল সামান্য চা খেয়ে নিতেন—তাও সেই আসনে বসেই, আসন ত্যাগ করতেন না। আর ভক্তদের খুব কৃপা করতেন। বিশেষ করে মেয়েদের তো একটা জুড়াবার স্থান ছিলেন। বিকেল চারটার পর থেকে সব মেয়েভক্তেরা আসতে শুরু করত। তিনি অক্লান্তভাবে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত সকলকে উপদেশাদি দিতেন। তারপর পুরুষ ভক্তদের ভিড় লেগে থাকত। অনেক রাত পর্যন্ত। তাঁর কৃপার হৃদয় সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। আহা, কি অদ্ভুতই না তাঁর জীবন—স্থির, ধীর, শান্ত, গম্ভীর! আমরা কখনো শরৎ মহারাজকে রাগ করতে দেখিনি। কেবল ভালবাসা আর কৃপা। এখন তিনি ঠাকুর ও মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মহানন্দে আছেন এবং সর্বক্ষণ ভক্তদের কল্যাণ কামনা করছেন। তাঁরা তো ঠাকুরের ভিতরেই ছিলেন, কেবল মধ্যে কিছুদিন লীলাবিগ্রহ ধারণ করে এ সংসারে ছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। তাঁদের তো আর পৃথক কোন সত্তা নেই! যারা তাঁদের ধ্যানচিন্তা করে তারাও ঠাকুরকেই ভাবনা করছে। সকল ভক্তেরা তো আর ঠাকুরকে দর্শন করেনি! তারা হয় তো স্বামীজী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ বা শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের কাউকে দেখেছে এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করছে ও ভালবাসছে! এই ভক্তি, ভালবাসা ঠাকুরেই গিয়ে পৌঁছুবে।

রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়াছে। কয়েকজন ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বরিশাল-নিবাসী। ক্রমে অশ্বিনীবাবুর কথা ওঠাতে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—তোমাদের বরিশালে অশ্বিনী দত্তের খুব নাম। আমরা তাঁর বাবা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়কে ঠাকুরের কাছে দেখেছি। তিনি সাব্‌জজ ছিলেন। একটি নতুন কলেজ স্থাপন করবেন বলে ঠাকুরের নিকট আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন। ঠাকুরের কাছে ঐ প্রার্থনা জানাতে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। বেশ লোক।

জনৈক ভক্ত—আচ্ছা, মহারাজ, ঠাকুর কি এইসব বৈষয়িক ব্যাপারেও আশীর্বাদাদি করতেন?

মহারাজ—তা করতেন বই কি। তাঁর ছিল দয়ার শরীর। যে-কোন সৎ বিষয়ে কেউ তাঁর আশীর্বাদ চাইলে তিনি খুব আগ্রহের সহিত তা করতেন।

ভক্ত—ঠাকুর দীক্ষাদি দিতেন কি?

মহারাজ—হাঁ, দিতেন, তবে খুব কম। তা ছাড়া তাঁর দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মতো কান-ফোঁকা দীক্ষা নয়! তিনি কাউকে বা স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, কারো জিবে কোন বীজমন্ত্র লিখে দিয়ে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করে দিতেন, বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে', আর 'মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে।' তিনি ভক্তদের অন্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত করে দিতেন, আর অধিকারিভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন করাতেন। একঘেয়েমি তাঁর ছিল না। যে যে-মার্গেই সাধনা করুক না কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন।

এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি তিনি নানাভাবে কেন সাধন করেছিলেন। সব ধর্মই সত্য, এবং সব ধর্মে সেই পরমপুরুষ সত্যরূপী শ্রীভগবানকেই লাভ করা যায়—এই নতুন সত্য আবিষ্কার ও উপলব্ধি করবার জন্যই যে তিনি সর্বধর্ম সাধন করেছিলেন, তা নয়। তাঁর সেই সাধনার গূঢ় অর্থ ছিল। সকল ধর্মকে পুনঃ উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি করেছিলেন নানাধর্মের সাধনা। তাই তো আজ সকল ধর্মের ভিতর নবজাগরণ এসেছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই ঠাকুরের জীবনকে আদর্শ করে চলেছে। কত শত খ্রীস্টধর্মাবলম্বী যে তাঁকে যীশুখ্রীস্ট বলে পুজো করছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব কারো প্রচারের ফলে হয় নি, ঠিক জানবে। তাঁকে কে প্রচার করতে পারে বল? সত্যস্বরূপকে কে প্রকাশ করবে? তাই তো গীতাতে আছে—'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।' —'সেই ব্রহ্মকে না সূর্য প্রকাশ করিতে পারে, না চন্দ্র, না অগ্নি।'

তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল অনেক অনেক মুসলমান নরনারীও ঠাকুরকে খোদার পয়গম্বর মহম্মদজ্ঞানে ভজনা করছে। আমি সে বৎসর (উতকামণ্ডে) নীলগিরি পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানকার ভক্তেরা কুনুরে একটি বাংলো ভাড়া করে আমাদের রেখেছিল। আমরা ওখানে আছি এই সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাক্তার সপরিবারে কুনুরে এসে হাজির। পরিচয় নিয়ে জানলুম, তিনি বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বিলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে—খাসা চেহারা। সামান্য দু-চার কথার পর ডাক্তারটি আমায় বললেন—'আমরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, তার কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর

স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বাল-গোপালভাবে ভজনা করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা যে তাঁর ইষ্টদেবই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি! বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করে বললেন—'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা! তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিব-মহিম্নস্তোত্রের কথা মনে হলো—

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।।'

—'হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাহা আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপ হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার!'

বাস্তবিকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়। তাঁকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরো অনেক মুসলমান ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাড্ডাপায়। খুব মানী লোক, গভর্ণমেণ্ট খান বাহাদুর title (খেতাব) দিয়েছে। ওঁরা সুফী সম্প্রদায়ের, কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। ঐ খান বাহাদুর ও স্থানীয় কালেক্টর—তিনিও মুসলমান—প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা করে আশ্রমটি করেছিলেন। আমরা তিন-চার দিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে, কি বিকেলে সেই খান বাহাদুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে আছেন খুব দীনহীনভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণা যে তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। এমনি করে কতভাবে যে ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন—তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য!

জনৈক ভক্ত—আমরা তো মহারাজ, সংসারে আসক্ত হয়ে রয়েছি। সাধন-ভজন করা তো দূরের কথা, তাঁর একটু স্মরণ-মননও করতে পারি নে। আমাদের গতি কি হবে?

মহারাজ—বাবা, সাধন-ভজন না করতে পার, কিন্তু তাঁর স্মরণ-মনন, তাঁর নামগুণগান তো করতে পার? সংসার তো আর তোমাদের দিনরাত বেঁধে রাখে নি? যদি কিছুই না করতে পার তবে আর কি করে হবে? আর কিছু না পারলেও তাঁর উপর একটা টান আনতে হবে। যে করেই হোক তাঁকে ভালবাসতে হবে। প্রাণে এতটুকু টান না এলে কি হয়? যতক্ষণ তা না আসে ততক্ষণ কিছুই হবে না। ঠাকুর যেমন বলতেন—'যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে খেলা করে, চুষি নিয়েই ভুলে থাকে, ততক্ষণ মা

একাজ সেকাজ করে বেড়ান। কিন্তু যখনই ছেলে চুষি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা, মা, বলে কাঁদতে আরম্ভ করে, তখনই মা হাতের কাজ ফেলে রেখে দুড় দুড় করে ছুটে এসে ছেলেকে কোলে নেন।' তোমরাও যতক্ষণ এই সংসার-চুষি নিয়ে ভুলে থাকবে ততক্ষণ আর তাঁর দর্শন পাবে না। এমন দুর্লভ মানব-জনম পেয়েও যদি হেলায় তা কাটিয়ে দাও তো বড়ই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। ঠাকুর এ গানটি প্রায়ই উপদেশচ্ছলে গাইতেন—

'মনরে কৃষিকাজ জান না।

এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।' এই গানেই আছে—

'অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।

এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।'

—ইত্যাদি। এসব গানে সার উপদেশ দেওয়া রয়েছে। তাই তো ঠাকুর সংসারাবদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য এসব গান গাইতেন।

ভক্ত—আমরা তো ঠাকুরকে মোটেই বুঝতে পারি নে। বরং আপনার কাছে আসতে ভাল লাগে। কিছুদিন না দেখলেই মনটা ছটফট করে, তাই আসি। আপনার কথা প্রায়ই মনে হয়, দেখতেও ইচ্ছে হয়। তা ছাড়া আর তো কিছু করতে পারি নে।

মহারাজ—তা আমরা তো ঠাকুর বই আর কিছু জানি নে—অন্তর-বাহির জুড়ে তিনিই রয়েছেন। তিনিই আমাদের all in all (সর্বস্ব)। এইটে ঠিক স্মরণ রেখো যে, আমরা তাঁরই সন্তান, তাঁরই পদাশ্রিত। আমাদের ভাবলেও তাঁকেই ভাবা হলো।

## কাশী

১১ অগ্রহায়ণ—৩ ফাল্গুন, ১৩৩৪ (২৭ নভেম্বর, ১৯২৭—
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮)

কাশীতে অবস্থানকালে মহাপুরুষ মহারাজ প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। কাশী শিবক্ষেত্র, সেজন্য ইতোপূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কেহই কাশীতে মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। অথচ মহাপুরুষ মহারাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন করিলেন—তাহা ভাবিয়া অনেক সাধু ও সেবকদের মনে কেমন একটা খট্‌কার সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সন্দেহ-নিরাকরণের জন্য একদিন জনৈক সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজ, আমাদের মনে একটা সন্দেহ এসেছে; আপনি দয়া করে সে সন্দেহটা মিটিয়ে দিন। শুনেছিলাম যে রাজা মহারাজ প্রভৃতি কেহই কাশীতে দীক্ষা দিতেন না, অথচ আপনি তো এখানে দীক্ষা দিচ্ছেন?

সেবকের এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর ও মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিতেছেন—দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার মোটেই নেই।

ঠাকুর কৃপা করে আমার ভিতর গুরুবুদ্ধি কখনো দেন নি। জগদ্‌গুরু হলেন শঙ্কর—আর এযুগে ঠাকুর। তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন; আবার তিনিই আমার অন্তরে বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্মা।

* * *

কাশী অদ্বৈতাশ্রমের দোতলার উপরে কোণের একটি ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকিতেন। শীতকাল। অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী-সমাগমে দুই আশ্রমই ভরপুর। অনেকে মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গ লাভ করিবার জন্যও তথায় সমবেত। আর নিত্যই বহু ভক্তের ভিড়—যেন ছোটখাট উৎসব, আনন্দের মেলা। একদিন সকালে যথারীতি দুই আশ্রমের সাধুগণ একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ-গ্রহণানন্তর ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—দেখ, কাল রাত্রে একটা ভারি মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি যে এক সৌম্য শ্বেতকায় পুরুষ—জটাজূটধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্যকান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি, কী সকরুণ চাহনি! তাঁকে দেখা মাত্রই ভিতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গর গর করে উপরের দিকে উঠতে লাগল—ক্রমে গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম, খুব আনন্দ! এমন সময় দেখি যে, সে মূর্তি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন এবং তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্যবদন। আমায় হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন—'তোর এখনো থাকতে হবে, আরো কিছু কাজ বাকি আছে।' ঠাকুর ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মন আবার নিচের দিকে আসতে লাগল এবং বায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগল। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ এসেছিলেন।

সন্ন্যাসী—আপনি কি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন?

মহাপুরুষজী—না হে, জেগে জেগে।

এইমাত্র বলিয়াই সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন।

## বেলুড় মঠ

২২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৪ (৬ মার্চ, ১৯২৮)

আজ দোলপূর্ণিমা। সকাল হইতেই খুব কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ও ভক্তেরা সকলেই হোলি-উৎসবে মাতোয়ারা। কীর্তন খুব জমিয়াছে এমন সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলের উৎসাহ যেন শতগুণে বাড়িয়া গেল। তিনিও কীর্তনে যোগদান করিলেন। তাঁহাকে শাড়ি পরাইয়া দেওয়া হইল। তিনি স্ত্রীবেশে নৃত্য করিতেছেন। গান চলিতেছে—

'খেলিব হোলি শ্যাম তোমারি সনে।
(তোমায়) একলা পেয়েছি আজ নিধুবনে।' ইত্যাদি।

সকলেই রামলাল দাদাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন—খুব আনন্দ। খানিক পরে শাড়ি পরিয়াই দাদা মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে উপরে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ঐ বেশে মহাপুরুষজী প্রথমে চিনিতে পারেন নাই।

বিকালবেলা জনৈক ভক্ত তাঁহার ছোট ছেলেটিকে প্রণাম করাইয়া বলিলেন—মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যাতে এর কল্যাণ হয়, আর ছেলেটি যেন ভাল হয়।

মহারাজ—আগে তোমরা নিজেরা যাতে ভাল হতে পার তাই কর। তোমরা ভাল হলেই ছেলেরা ভাল হবে।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মহাপুরুষজী ছাদের উপর একটু পায়চারি করিতেছেন। আরতির আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামলাল দাদা ছাদে আসিলেন। তাঁহাকেদেখিয়াই মহাপুরুষজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এস দাদা, সকালবেলা তোমাকে খুব মানিয়েছিল। তুমি আমার কাছে যখন এলে আমি তো প্রথমটায় চিনতেই পারি নি! ভাবছিলুম এ আবার কাদের বাড়ির মেয়ে? শেষে দেখি, না রামলাল দাদা! দুজনেই হাসিতে লাগিলেন। পরে রামলাল দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি অনেক লোকের দীক্ষা হলো?

মহারাজ—হাঁ, দাদা।

দাদা—অনেকক্ষণ ধরে একাসনে বসে থাকতে আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়?

মহারাজ—কষ্ট কোথায়? এ তো আনন্দ। ঠাকুরের নাম শোনাব, সে তো আনন্দের কথা। কত লোক ভক্তিভরে আসে তাঁর নাম শুনবে বলে! লোকের ব্যাকুলতা ও আগ্রহ দেখে আর স্থির থাকতে পারি নে। আর এদের আকর্ষণ করে আনছেন তো ঠাকুরই। যতদিন এ শরীর থাকবে ততদিন তাঁর কথা বলব, তাঁর নাম শোনাব। এই জন্যই তো ঠাকুর রেখেছেন।

দাদা—আপনার দয়ার শরীর, তাই কষ্ট করেও এসব করছেন।

কিয়ৎকাল উভয়ে চুপ করিয়া আছেন। পরে মহাপুরুষজী খুব গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—হাঁ, দাদা। ঠাকুর যে ঈশ্বর, সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার আকর্ষণেই আমরা তাঁর কাছে ছিলুম। এখন দেখছি, ও বাবা! দেখতে ছোট্ট মানুষটি, নড়াচড়া করতেন সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু তিনি কি বিরাট! কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই না তাঁর ভিতরে রয়েছে!

দাদা—আমারও এমনই মনে হতো। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখতাম বিদ্যুতের মতো একটা আলো মনের উপর খেলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঢাকা পড়ে যেত, সন্দেহ প্রভৃতি নানা জিনিস এসে ঢেকে দিত। একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলুম—'এ রকম কেন হয়?' তাতে ঠাকুর বললেন—'নইলে এখানকার কাজ (অর্থাৎ তাঁর সেবাদি) কি

করে চলবে, আর কালীবাড়ির পূজাই বা কেমন করে চলবে? আর তোমার (সম্পর্কিত) স্ত্রীপুরুষদেরই বা কে দেখবে?'

মহারাজ—হাঁ, হাঁ। নতুবা তাঁর যে লীলা চলে না।

দাদা—এখন তাঁর ভক্তসংখ্যা বেড়েছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে কত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ভাব! যাদের ভাষা জানি নে, এমন কত লোক দেশ দেশান্তর থেকে এসে পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ধূলি নিয়ে যায়, অশ্বত্থপাতা নিয়ে যায়, বেলপাতা নিয়ে যায়!

এবার আরাত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। সাধুভক্তেরা সমস্বরে 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' ইত্যাদি গাহিতেছেন।

দাদা—এই স্তোত্রটি শুনতে বড় ভাল লাগে। আমি যখনই শুনি, মনে হয় যেন ঠাকুর গভীর সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে এ স্তোত্র পাঠ করছে। যাই, ঠাকুরঘরে যাই।

এই বলিয়া রামলাল দাদা ঠাকুরঘরে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ এ স্তোত্র সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—আগে মঠে আরতির সময় এ স্তোত্র গাওয়া হতো না। তখন 'জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার' ইত্যাদি বারংবার গাওয়া হতো। তারপর স্বামীজী নিজে 'খণ্ডন-ভববন্ধন' এই স্তবটি রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইতেন। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তাঁর ভৈরবের মতো দিব্যকান্তি শরীর; তার উপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন গাইতেন, সে যে কি এক গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হতো তা আর কি বলব!

## বেলুড় মঠ

চৈত্র মাস, ১৩৩৪ (এপ্রিল, ১৯২৮)

এবার কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তত ভাল নাই। প্রায়ই মাথা ঘোরে, হাঁটিতে পারেন না—হাঁটিতে গেলে পা টলে। শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—শরীর ভাল নেই, একটা না একটা কিছু অসুখ লেগেই আছে। এসব হচ্ছে নোটিস। শরীর যে আর বেশি দিন থাকবে না তার নোটিস দিচ্ছে। তা আমরাও ready (প্রস্তুত) হয়ে আছি, we are ever ready to jump into Mother's lap—(মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমরা সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছি)। শ্রীগুরুর কৃপায় এটা বেশ বুঝতে পারছি যে এই শরীরটা আমি নই। সে জ্ঞান তিনি দয়া করে খুব পাকা করে দিয়েছেন।

২৩ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৫ (৭ জুলাই, ১৯২৮)

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরে বসিয়া মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। আরও কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে সেই সন্ন্যাসী বলিলেন—emotion-ই (ভাবই) সব, reason (বিচার) কেবল একটু পথ দেখায়। হরি মহারাজও বলতেন যে emotion-ই মানুষকে ধর্মপথে টেনে নিয়ে যায়, আর intellect (বুদ্ধি) সামান্য সাহায্য করে মাত্র, খালি বিচার বা বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম বোঝা যায় না।

মহারাজ—ধর্ম হলো অনুভূতির জিনিস—উপলব্ধির বস্তু। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'Religion is realisation'—অনুভূতিই ধর্ম। তার পূর্ব পর্যন্ত intellect-এর (বুদ্ধির) এলাকা, তখনো কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্ম-জীবন আরম্ভ হয় নি! ঠাকুর সাধারণ কথায় যেমন বলতেন—'কলসী যতক্ষণ না ভরতি হচ্ছে, ততক্ষণই ভক্‌ভক্‌ শব্দ করে, কিন্তু একবার ভরে গেলে সব চুপ।' কেমন সুন্দর উপমা! তাঁর ছোট্ট ছোট্ট কথার ভিতর কত গূঢ় অর্থ রয়েছে! উপনিষদও বলছে 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। ঠিক কথা, মানুষ তার এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে বুঝবে? অসম্ভব। তাইতো ঠাকুর গাইতেন—'কে জানেরে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।' এই বলিয়া খুব তন্ময়ভাবে মহাপুরুষজী গানটি গাহিলেন। 'মহাকাল জেনেছে কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন?' এই অংশটি বারংবার আবৃত্তি করিলেন এবং খানিক পরে যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলেন—'Intellect (বুদ্ধি) দ্বারা মানুষ সেই অব্যক্তকে বুঝবে? সেই মহামায়া কৃপা করে যদি আবরণ একটু সরিয়ে দেন তবেই। ঋগ্বেদে নাসদীয়সূক্তে সেই অব্যক্ত অবস্থার বেশ সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

এই বলিয়া মহাপুরুষজী সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন—

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং<br>
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।<br>
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম-<br>
ন্নম্ভঃ কিমাসীদগহনং গভীরম্।।'

আহা, কি চমৎকার! এই টেবিলের উপর একখানি খাতায় সবটা লেখা রয়েছে । আমি মাঝে মাঝে পড়ি—ঠিক গভীর ধ্যানের অবস্থা এতে বর্ণনা করা রয়েছে। পড় তো একবার।

তদনুসারে সেই খাতাখানি নিয়া জনৈক সন্ন্যাসী নাসদীয়সূক্ত পাঠ করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষজীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন।

'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহ-
প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।

*　　*　　*

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।'

সূক্তগুলি পাঠ শেষ হইল। উপস্থিত সকলেরই প্রাণ একটা শান্ত গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মহাপুরুষজী সূক্তগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে বলিলেন, তদনুসারে বাংলা অনুবাদ পড়া হইতেছে।

'তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না—পৃথিবীও ছিল না, অতি দুরবিস্তার আকাশও ছিল না—আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল?

'তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র-অবলম্বনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

'সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল, অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

'এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল—কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরম ধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।'

অনুবাদপাঠ সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—দেখ, এসব অতি উচ্চ অবস্থার বর্ণনা। যোগিগণ ধ্যানাবগাহিতচিত্তে এ অবস্থা উপলব্ধি করেছেন। এতে সাধারণ মনোবাক্যের অতীত অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। স্বামীজী নাসদীয়সূক্ত খুব আবৃত্তি করতেন।

তিনি সুর করে বৈদিক ছন্দে এমন সুন্দর পাঠ করতেন যে তা শুনে মনে হতো যেন কোন বৈদিক ঋষি তাঁর উপলব্ধি সব বলছেন। 'তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং' ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি করে বলতেন যে এমন কবিত্ব আর কোন ভাষাতে নেই। তিনি এ শ্লোকটি খুবই ভালবাসতেন। তাঁর কোন লেখার মধ্যেও তিনি ঐ ভাবটা অতি সুন্দর ফুটিয়েছেন।

সন্ন্যাসী—হাঁ মহারাজ, 'বীরবাণী'তে আছে—'অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু'—ইত্যাদি।

মহারাজ—হাঁ, ঐ 'অন্ধকার উগরে আঁধার' কেমন সুন্দর expression (ভাবপ্রকাশ)! এসব হলো প্রলয়ের অবস্থার বর্ণনা। সেই unmanifested (অব্যক্ত) অবস্থা হতে পরে ক্রমে ক্রমে সব manifested (ব্যক্ত) হয়েছে।

## বেলুড় মঠ

২১ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৩৫ (৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮)

বিকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজ মঠের উপর তলার পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বেলা সাড়ে-পাঁচটা। শীতকাল, গায়ে পাতলা একটি ফ্ল্যানেলের জামা। blood-pressure (রক্তের চাপ) বেশি বলিয়া গায়ে গরম জামা রাখিতে পারেন না; রাত্রেও খুব সামান্য গাত্রাবরণ ব্যবহার করেন। কয়েকটি যুবক ভক্ত আসিয়াছেন। সকলেই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, কুশল-প্রশ্নাদির পর মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদিগকে বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিভাবে পড়াশুনা হয়, ছেলেদের জন্য খেলাধুলার বন্দোবস্ত আছে কিনা, ইত্যাদি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—অন্তর্মুখ ভাব। কখনও একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে তাকাইয়া আছেন, কখনও বা অর্ধনিমীলিত চক্ষু। পরে আস্তে আস্তে সকলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তোমরা নিত্য নিয়মিত একটু একটু জপ-ধ্যান কর তো?

জনৈক ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

মহারাজ—কখন কর?

ভক্ত—বিকালবেলা স্কুলের কাজ কর্ম সব সেরে একটু বিশ্রামের পর ঠাকুরঘরে গিয়ে জপ-ধ্যান করি। যেদিন সকালে বিশেষ কাজকর্মের ভিড় না থাকে সেদিন সকালেও ঠাকুরঘরে যাই। যদি সকালবেলা সময় না পাই তো দুপুরে স্কুলে যাবার পূর্বে ঠাকুরঘরে গিয়ে অন্তত একবার ঠাকুর প্রণাম করে আসি।

মহারাজ—ঠাকুর প্রণাম তো করবেই, একটু-আধটু ধ্যানও করবে। রাত্রেই ধ্যান-জপের প্রশস্ত সময়। যতটুকু সময়ের জন্যই হোক একবার নিজেকে সব কাজকর্ম থেকে

আলাদা করে ফেলতে হবে। সে সময়ে মন থেকে সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, নিজেকে সব থেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ করে ফেলবে। দিনান্তে অন্তত একবার এটা করা চাই-ই—তা যতক্ষণের জন্যই হোক। কাজকর্ম, সংসারের সুখদুঃখ, এ তো আছেই। কিন্তু এ-সবই অনিত্য—সবই দু-দিনকার জন্য। সংসার যে অনিত্য, এর চাইতে নিশ্চিত আর কিছুই নেই। অবশ্য তোমরা যা করছ এ খুব ভাল কাজ। কিন্তু একাজ থেকেও মনকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তুলে নিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতে হবে। তখন একমাত্র সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের নিত্য সত্য মঙ্গলময় রূপে ডুবে যাবে। একমাত্র ভগবানই হৃদয় জুড়ে থাকবেন, আর জীবজগতের কোন ভাবনা থাকবে না, এমন কি নিজের ভাবনাও নয়। আর প্রার্থনা করবে—'হে প্রভু, আমায় ভক্তিবিশ্বাস দাও, জ্ঞান দাও, আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' প্রাণভরে এই প্রার্থনা করবে! এমন ধ্যান করবে যে, তাঁর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাবে—অভেদবোধ। এইটে করাই চাই। আবার বলছি, বাবা, দিনান্তে যতক্ষণের জন্যই হোক একবার সব ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতেই হবে! তা করতে প্রথম প্রথম হয়তো খুব কষ্ট হবে, পারবে না। কিন্তু তাই বলে ছেড়ো না। খুব প্রার্থনা করো, তবেই তিনি মনপ্রাণ শান্ত করে দেবেন। তিনিই কৃপা করে তোমাদের মনে বল দেবেন, তাঁর সঙ্গে এক করে নেবেন। ধ্যান করতে করতে মনের শান্তি বাড়বে এবং তখনই সেই মন দিয়ে ঠিক ঠিক লোকহিতকর কাজ সম্ভব। এইটে পাকা করে জেনে রেখো যে, এ জগৎ তাঁর, জীব তাঁর, সৃষ্টি তিনিই করেছেন। তোমরা তাঁর দাস, তিনি কৃপা করে তোমাদের দ্বারা তাঁর জীবের যতটুকু সেবা করিয়ে নেন, ততটুকুই তোমরা ধন্য। ভগবৎধ্যান করতে করতে নিজের 'অহং' একেবারে নষ্ট করে ফেলবে; তখন কেবল তিনিই থাকবেন। মনের এই অবস্থা যখন হয়, তখনই হবে তোমাদের দ্বারা ঠিক ঠিক জনহিতকর কাজ।

## বেলুড় মঠ

২ চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৫ (১৬ মার্চ, ১৯২৯)

তিন দিন হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে মঠে সতের জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং একুশ জন যুবক ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এই হোমাদির সময় মহাপুরুষ মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দিয়াছিলেন। সেইদিন সকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার খুব সর্দি হইয়াছে। আজ পূর্বাপেক্ষা কতকটা ভাল। সকালবেলা বেশ প্রফুল্ল ভাব, যদিও শরীর সুস্থ নয়। নানা কথাবার্তা হইতেছিল, হঠাৎ নবদীক্ষিত একজন সন্ন্যাসীকে

লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি হয়েছে?

অপর একজন সন্ন্যাসী নবদীক্ষিতের নাম বলিয়া দিলেন। তখন মহাপুরুষজী খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন—বাবা, এর পর যা হবার তা স্বয়ং ভগবান কৃপা করে না দিলে আর হবে না। সন্ন্যাস নেওয়া তো সোজা, কিন্তু পরাভক্তি, পরমজ্ঞান—এসব তাঁর বিশেষ কৃপা না হলে কিছুই হয় না। তবে যদি কেউ ব্যাকুল হয়ে চায় তো তিনি দেনও। পূর্ণজ্ঞান, ভক্তি যদি না হলো তো খালি গেরুয়া পরে কি লাভ? পশ্চিমে তো দেখেছি—এই কাশী, হরিদ্বার অঞ্চলে—অনেক অনেক মঠ আছে, আর ওদিকের লোকেরা কেউ বা কিছু আটা, কি নতুন কাপড়, অথবা এক-আধ টাকা নিয়ে এসে কোন মোহন্তের কাছে হাজির হয় আর বলে—'বাবা, বিজাহোম করিয়ে দাও।' বিরজাহোমও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে জানে না, বলে 'বিজাহোম'। আর মোহন্তও 'বিজা'হোম করিয়ে দিলে; ব্যস। সে সন্ন্যাসী-চেলা হয়ে গেল। তারপর ভিখ মেগে খায়, আর থাকে। আবার কখনো ব্যবসা বা তেজারতি কাজও জুড়ে দিলে। এ-রকম লাখ লাখ সন্ন্যাসী তো সব রয়েছে! কিন্তু বাবা, ঠিক ঠিক মুমুক্ষু কজন? সন্ন্যাস নেব, বিরজা করব, মন্ত্র পড়ব—এসবের জন্য যে ব্যাকুলতা হয় সে ব্যাকুলতা যদি কারো ভগবানলাভের জন্য হয়, সে তো ধন্য, সে তো মহাভাগ্যবান! সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে ভগবানকে চায় সেই মহাধন্য। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। যাদের এ অবস্থা হয়েছে তারা বাহ্যিক ভেকের (বেশের) দিকে আর নজর দেয় না—কাপড় সাদাই থাক আর গেরুয়াই থাক। বাবা, আসল জিনিসের দিকে নজর দাও সব।

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী খুব কাতরভাবে মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করায় তিনি বলিলেন—বাবা, আমরা তো খুবই প্রার্থনা করছি। তোমাদের ভক্তিবিশ্বাস লাভ হোক, পরমজ্ঞান লাভ হোক, মুক্ত হয়ে যাও, সব জীবন্মুক্ত হয়ে যাও তোমরা। জয় প্রভু করুণাময়, দীনশরণ ঠাকুর!

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীদের কেহ কেহ পূর্বদিন মাধুকরী করিতে গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিলেন—এদিকে মাধুকরীর চলন নেই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুব আবেগভরে বলিতেছেন—এই তোমার চরণে এরা মুমুক্ষু সব এসেছে; ঠাকুর, এদের ভক্তিবিশ্বাস দাও, পরিপূর্ণ করে দাও।

### বেলুড় মঠ

৩ চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৫ (১৭ মার্চ, ১৯২৯)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট জন্ম-মহোৎসব। মহাপুরুষ মহারাজের শরীর ভাল নয়, সর্দির ভাব খুবই রহিয়াছে। পূর্বরাত্রে ঘুমও ভাল হয় নাই। অনেক ভক্ত, যাঁহারা

মহাপুরুষজীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছুক, খুব সকাল হইতেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ একটু বেলা হইলে আর দর্শনের সুবিধা হইবে না। জনৈক বৃদ্ধ ভক্ত আসিয়া প্রণামান্তে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজ খুব প্রফুল্লমুখে বলিতেছেন—শরীর মোটেই ভাল নয়।

ভক্ত—কি হয়েছে, মহারাজ? রাত্রে কি ঘুম ভাল হয় নি?

মহারাজ—না, ঘুম তত মন্দ হয় নি। তবে কি জান, বৃদ্ধ শরীর, কত সব complaint (উপসর্গ) লেগেই আছে। ষড়্-বিকারাত্মক[১] শরীর। দেহের ধর্মই এই। এখন শেষ বিকার নশ্যতি-র (বিনাশের) দিকে চলেছে। অবশ্য এসব বিকার দেহেরই, পরমাত্মা যিনি ভিতরে রয়েছেন তিনি যেমন তেমনি আছেন; তাঁকে এসব affect (অভিভূত) করতে পারে না। যিনি দেহী তিনি ঠিক আছেন। শরীর তো আর আত্মা নয়। ঠাকুর কৃপা করে সে জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এখন শরীর যাক আর থাক।

ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—ঠাকুর পূর্ণজ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন ভিতরে। এখন তাঁর ইচ্ছা হয়তো শরীর থাকবে, নইলে শরীর যাবে। তাঁর যেমন ইচ্ছা। আর এ দেহের বয়স তো কম হয় নি!

## বেলুড় মঠ

### ৫ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৫ (১৯ মার্চ, ১৯২৯)

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শরীর আজ তত ভাল নয়। মাত্র দুই দিন পূর্বে রবিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসব খুব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় লক্ষ লোক ঐ উৎসবানন্দে যোগদান করিয়াছিল। সেই দিন খুব ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত নরনারী মহাপুরুষজীর দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিল। ভক্তদের জন্য সর্বক্ষণ অবারিত দ্বার। তিনিও ঠাকুরের ভাবে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, শরীরের দিকে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না—যেন দৈববলে বলীয়ান হইয়া অক্লান্তভাবে সকলের সঙ্গে আনন্দে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিয়া এবং নানাপ্রকার ধর্মোপদেশদানে ভক্তদের প্রাণে বিমল আনন্দসুধা বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে দিনের অতিরিক্ত ক্লান্তির দরুন শরীর আরো বেশি খারাপ হইয়াছে; কিন্তু তিনি সদা প্রফুল্ল, সর্বদা আনন্দময়।

আজ সকাল হইতেই মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ একে একে ভক্তি-নম্রভাবে তাঁহার ঘরে সমবেত হইতেছেন। তিনিও সকলকে কুশলপ্রশ্নাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছেন। একজন সন্ন্যাসীর পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া তখনই তাঁহাকে একখানি নূতন কাপড় দিবার জন্য নিকটস্থ সেবককে আদেশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—সাধুদের

১ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ।

কার কি দরকার না দরকার তাও তোমরা একটু খোঁজ খবর রাখতে পার না?

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁহার সামনে আসিতেই 'ওঁ নমঃ শিবায়, জয় মা' বলিয়া অভিবাদন করিতেছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের সম্বন্ধে কথা উঠিল। নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সকলেই আজ দক্ষিণেশ্বরে ঁভবতারিণীকে দর্শন করিতে যাইবেন এবং সমস্ত দিন তথায় ধ্যান-ভজনাদিতে অতিবাহিত করিবেন। মন্দিরের পরিচালকগণ তথায় ত্রিশ জন সাধুর প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সব শুনিয়া মহারাজ খুব আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন—দক্ষিণেশ্বর আমাদের ভূস্বর্গ, আমাদের কৈলাস, বৈকুণ্ঠ। ও কি কম স্থান গা? পঞ্চবটী মহা সিদ্ধপীঠ। ঐ পঞ্চবটীতে ঠাকুরের কত ভাব মহাভাব হয়েছিল, ঠাকুর বার বৎসর ধরে কত বিভিন্ন ভাবের সাধনা ঐ দক্ষিণেশ্বরে করেছিলেন! কত দিব্য দর্শন, কত দিব্য অনুভূতি ওখানে তাঁর হয়েছিল, তার তুলনা হয় না! আর কোন অবতার-পুরুষের জীবনে এত কঠোর ও বিভিন্ন ভাবের সাধনা ও এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ধর্ম-ইতিহাসে দেখা যায় না। ঠাকুর বলতেন—'এখানকার সব অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে।' তাই তো স্বামীজী ঠাকুরের সম্বন্ধে বলেছেন—'অবতারবরিষ্ঠায়'। ঠাকুর বৃন্দাবনের রজঃ এনে পঞ্চবটীতে ছড়িয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। অদ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব, শৈব বা তান্ত্রিক সকলের কাছেই দক্ষিণেশ্বর মহাপীঠ। কারণ ঠাকুর সব ভাবের সাধনা করে ওখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এবার ভগবানের মহাসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ। স্বয়ং আদ্যাশক্তি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা সেই জগজ্জননী স্বয়ং ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করেছেন। ঠাকুরের অলৌকিক তপস্যায় 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি লোকসমুদয় পর্যন্ত উপকৃত হবে। উঃ, কী মহাশক্তির খেলা! বলিতে বলিতে মহাপুরুষজীর সমগ্র মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি অধোবদনে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

দুপ্রহরে সবেমাত্র মহাপুরুষজী আহারে বসিয়াছেন এমন সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে প্রণামানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার শরীর আজ কেমন আছে, মহারাজ?

মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে বলিতেছেন—এ শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? শরীর এখন টলটলায়মান অবস্থায়, কখন যে কি হয় তার কিছুই স্থিরতা নেই। এখন তোমরা সব ঠাকুরের কাজকর্ম দেখেশুনে নাও। এবার ঠাকুর আমায় রেহাই দেবেন বলে মনে হচ্ছে। শরীরের ভিতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, জোর মোটেই নেই। তবে মনের শক্তি তিনি দিন দিন খুব বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি তো এখন নির্বাণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে দেখছি সেই বিরাট আনন্দধাম। ঠাকুর কৃপা করে ক্রমে ক্রমে সব খুলে দিয়েছেন—নির্বাণের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ব্যস, ঠাকুর সব দেখিয়ে দিয়েছেন,

পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) এখন আর কোন ভাবনা নেই—শরীর যাক আর থাক।

শুদ্ধানন্দ—সে কি মহারাজ! আমাদের তো দৃঢ় ধারণা ঠাকুর বহু লোকের কল্যাণের জন্য, এই সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য আপনাকে আরো দীর্ঘকাল নিশ্চয়ই রেখে দেবেন। আজকাল আপনার ভীষণ ক্লান্তি হচ্ছে, তাতেই শরীর বেশি খারাপ হয়েছে। আপনার যাতে কোন প্রকার strain (ক্লান্তি) না হয় তার জন্য আমরা সকলেই খুব চেষ্টা করছি। আপনার শরীর যতদিন আছে, বহু লোকের কল্যাণ—আমরাও কত নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপুরুষজী—তোমরা সকলে যে আমায় খুব ভালবাস তা আমি খুব জানি এবং আমিও তোমাদের মতো সাধুভক্তসঙ্গে বেশ আনন্দেই আছি। আর এও ঠিক জেনেছি যে, এ শরীরদ্বারা তাঁর যতটুকু কাজ হবার তাও কড়ায় গণ্ডায় তিনি করিয়ে নেবেন; তার পূর্বে ঠাকুর ছাড়বেন না। এক এক সময় ভাবি, ঠাকুর এ শরীরটা এখনো কেন রেখেছেন? নিশ্চয়ই তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নইলে তিনি এ ভাঙা শরীরটা নিয়ে এখনো এত নাড়াচাড়া কেন করবেন? আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, আমি বলতে কইতে পারি নে—তবু তিনি তাঁর এ ভাঙা যন্ত্রটা দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার মানসে বলিলেন—গঙ্গাধর মহারাজকে আনতে এরা তিনজন গিয়েছে।

মহাপুরুষজী—হাঁ, গঙ্গাধর আসে তো বেশ হয়। ঠাকুরের লোক, দেখলেও কত আনন্দ হয়। ওকে ধরে পাকড়ে না আনলে ও আসতে চায় না। খোকাও তো আজ আসছে। আহা, খোকা মহারাজের শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

শুদ্ধানন্দ—না, এখনো হয়নি। আজ সকাল থেকেই আপনার কাছে 'আসব আসব' করছি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি—আপনার কাছে তো প্রায় সব সময়ই ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে।

মহাপুরুষজী—আহা! তবে যাও যাও, খাও গে; আর বেশি দেরি করো না।

এই কথা বলাতে তিনি চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপন মনেই বলিলেন—প্রভু, সকলের কল্যাণ কর, সকলের চৈতন্য কর।

আহারান্তে একজন সেবক তাঁহাকে খাবার-আসন হইতে সযত্নে তুলিয়া দিল। আজকাল নিজে উঠিতে তাঁহার খুবই কষ্ট হয়। তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার ঘরের সামনের দিকের বারান্দায় জনৈক সন্ন্যাসী কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া খাইতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—এই যে নী—তো এবার (তপস্যায়) চলল।

সন্ন্যাসী—আজ্ঞে হাঁ। আগামী বৃহস্পতিবার যাব মনে করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—তা যাও। সকলেই যাবে। এই তো সংসার! দু-দিনের জন্য দেখাশুনা, তার পরে কে কোথায়। পরমানন্দময়ী মা-ই সত্য,

আর সব দুদিনের। সৃষ্টি প্রবাহাকারে নিত্য নিরন্তর চলছে, বিরাম নেই। এই সব সৃষ্টির পরপারে নিত্যানন্দময়ী মা—বাক্য মনের অতীত, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

### বেলুড় মঠ

৬ চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৫ (২০ মার্চ, ১৯২৯)

দক্ষিণ-ভারতবাসী জনৈক সন্ন্যাসী প্রাতঃকালে আসিয়া ভক্তিভরে মহাপুরুষ মহারাজের চরণে প্রণত হইলে তিনি বলিতেছেন—'Blessed are those who have not seen me but have faith in me' (যাহারা আমাকে দেখে নাই কিন্তু আমাতে বিশ্বাসবান তাহারা ধন্য)। You are really blessed, though you have not seen Thakur, still you have faith in him (তুমি বাস্তবিকই ভাগ্যবান। তুমি যদিও ঠাকুরকে দেখ নাই, কিন্তু তাঁহাতে বিশ্বাসবান)।

বিকালবেলা একজন ভক্ত প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন—আশীর্বাদ করুন।

মহাপুরুষজী উত্তরে বলিলেন—আশীর্বাদ করছি বই কি, খুব আশীর্বাদ করছি। We have blessings only, no curse (আমাদের কেবল আশীর্বাদই আছে—অভিশাপ নেই)। আমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর যে কিছু নেই, বাবা!

### বেলুড় মঠ

৮ চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৫ (২২ মার্চ, ১৯২৯)

মহাপুরুষজী দ্বিপ্রহরে তাঁহার ঘরের মেজেতে আহারে বসিয়াছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন মুচি উঠানে আমগাছের নিচে বসিয়া মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জুতা সেলাই করিতেছে। আহার শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া জনৈক সেবককে বলিতেছেন—আহা! এ দুপুরবেলা আমরা সকলে খেলুম, আর এ বেচারী অভুক্ত এখানে বসে কাজ করছে! একে বেশ ভাল করে ফল মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে এস তো।

আদেশমত সেবক মুচিকে ফল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, মহাপুরুষজী খাবার-আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন এবং জানালায় দাঁড়াইয়া মুচির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন—হাতে একটি আধুলি। মুচি প্রসাদ পাওয়া মাত্রই হাতের কাজ বন্ধ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—আহা! দেখছ, ওর খুবই খিদে পেয়েছিল, তাই প্রসাদ পাওয়ামাত্রই খেতে শুরু করেছে। দাঁড়াও, আমি একটা মজা করছি, দেখবে।

এই বলিয়াই হাতের আধুলিটি মুচির সামনে ছুড়িয়া দিলেন। মুচি অপ্রত্যাশিতভাবে আধুলিটি উপর হইতে পড়িয়াছে দেখিয়া উপরের দিকে তাকাইতেই মহাপুরুষজীকে দেখিতে পাইল এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নানাভাবে হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। খানিক পরে জনৈক সন্ন্যাসীকে জুতা সেলাই-র জন্য মুচির সঙ্গে দর-কষাকষি করিতে দেখিয়া তিনি খুবই ব্যথিত চিত্তে বলিলেন—আহা, গরিব লোক, এর সঙ্গে আবার দরদস্তুর করা কেন?

* * *

রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজ খুব সামান্যই আহার করেন—কোন দিন খালি একটু দুধ বা দুটি মনক্কা বা প্রুন (prune) দুধে ফেলিয়া খান। আজ রাত্রিতেও একটু দুধ খাইতেছেন। এমন সময় স্বামী—প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। নানা প্রসঙ্গের পরে ক্রমে মঠ ও মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। মহাপুরুষজী বলিতেছেন—এখন তোমরা সকলে এসেছ, আমার খুবই আনন্দ হয়েছে। ঠাকুর এক-একটা নাড়াচাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্ঘশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে দিচ্ছেন, আর দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কাজ একা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা হবার নয়—এই সমস্ত সাধুমণ্ডলী একত্রিত হয়ে কাজ করবে এবং তখনই সব সুনিয়ন্ত্রিত হবে। আর যত ঝড়-ঝাপটা, আপদ-বিপদ আসবে ততই জেগে উঠবে ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তি। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', যত বাধা-বিপত্তি আসবে ততই বেড়ে যাবে ঠাকুরের উপর সকলকার ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁর যুগধর্ম-প্রবর্তনের জন্যই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি এবং তিনি এই সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভিতর দিয়ে কাজ করছেন। আর এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে—কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ, বাবা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামীজীর কথা।

সন্ন্যাসী—স্বামীজী যা বলে গেছেন আর আপনারাও যা বলছেন তা কখনোই মিথ্যা হবার নয়। কিন্তু মহারাজ, সময় সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ে। কাজকর্ম করার উৎসাহ একেবারে দমে যায়—যেন কেমন একটা ভয় ও অবিশ্বাস এসে মনকে ঘিরে ফেলে।

মহাপুরুষজী—তা তো হবারই কথা। বহু বার ভয় হবে, বিতৃষ্ণা আসবে, আবার সব কেটে যাবে। কাজের ধারাই এই। জগতে এমন কোন্ কাজ আছে যা অবাধে হয় বল? কাজ যত বড়, বাধা-বিঘ্নও তার তত বেশি এবং সেই সংঘর্ষের দ্বারাই আত্মশক্তি জেগে ওঠে। সেই শক্তি আর কেউ নয়—স্বয়ং 'মা'। কাজকর্ম সব তাঁর, আর আমরাও তাঁরই। সত্যপথে থেকে এই জ্ঞান পাকা রেখে কাজ করে যেতে হবে। এ যে যুগধর্মসংস্থাপনের কাজ। তাই তো তিনি আমাদেরও এতে টেনে এনেছেন। নইলে আমরা কি আর ভজন-সাধনে মগ্ন হয়ে থাকতে পারতাম না? করছিলামও তো তাই; কিন্তু ঠাকুরের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে স্বামীজীই এসব কাজের প্রবর্তন করলেন এবং আমাদের

সকলকেও টেনে আনলেন। দেখ না, স্বামীজী নিজেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কী অক্লান্তভাবে কাজ করে গেলেন! খেটে খেটে তাঁর দেহ নাশ হয়ে গেল। আর তাঁর পক্ষেও কি সব কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে করা সম্ভব হয়েছিল? তাঁর পাশ্চাত্য দেশে যাবার ব্যাপারই দেখ না। কত শত বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে তাঁকে শ্রীভগবানের কাজ করতে হয়েছিল! আমার তো সময় সময় মনে হয় যে, আর ঠাকুরের সগুণ ভাব নিয়ে থাকব না, একেবারে নির্গুণ অবস্থায় চলে যাই—সমাধিস্থ হয়ে বুঁদ হয়ে থাকি। কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিচ্ছেন কোথায়? অবশ্য তিনিই সব; সগুণও তিনি আবার নির্গুণও তিনি। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কিছুই করবার জো নেই। তিনি যখন যে অবস্থাতে রাখেন তখন সেই অবস্থাতেই থাকতে হবে। তবে তিনি কৃপা করে সব দেখিয়ে দিচ্ছেন—সেই অমৃতধামের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যাঁকে ধরতে না পেরে মনের সঙ্গে বাক্য তাঁ থেকে ফিরে আসে।

## বেলুড় মঠ

৯ চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৫ (২৩ মার্চ, ১৯২৯)

গত কয়েক দিন যাবৎ মহাপুরুষ মহারাজের খুবই সর্দি হইয়াছে। আজ সর্দির ভাবটা ওরই মধ্যে একটু কম। শারীরিক অসুস্থতার দিকে তাঁহার মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই—খুব অসুখের সময়ও তিনি সদানন্দ। দেহের কষ্ট বা বিপদ-আপদ তাঁহার কূটস্থ মনের উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সকালবেলা প্রায় আটটার সময় জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী এক শাখাকেন্দ্র হইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে আসিয়া মহাপুরুষজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?

মহাপুরুষজী—এ বৃদ্ধ শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? এ বয়সে শরীর কি আর ভাল থাকে?

সন্ন্যাসী—তাই তো দেখছি, মহারাজ, আপনার শরীর কি হয়ে গেছে! দেখলেও কষ্ট হয়।

মহাপুরুষজী—এ শরীর আর বেশি দিন নয়। শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে আমার যেন ডান অঙ্গ ভেঙে গেছে, মন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। আমিও তখনই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। শরৎ মহারাজের শরীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরও খুব খারাপ হয়েছিল। কাজকর্ম থেকে মন একেবারে উঠে গিয়েছিল। ঠাকুরকে ধরেও ছিলাম যে, আমি আর থাকব না। ঠাকুর তা শুনলেন না। তিনি জোর করে রেখে দিলেন, তাই আছি। কেন যে তিনি যেতে দিলেন না—তা তিনিই জানেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যতদিন রাখবেন—থাকতেই হবে।

সন্ন্যাসী—তাই বলুন মহারাজ যে, ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তাই হবে। আমরা ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করছি যাতে তিনি আপনাকে আরো দীর্ঘকাল আমাদের জন্য রেখে দেন। আপনি চলে গেলে যে সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশই কমে যাবে। আপনাকে হাতেনাতে কোন কাজ করতে হবে না। আপনি কেবল বসে থাকুন; আপনার ইচ্ছাশক্তিতেই সব কাজ ঠিক ঠিক হয়ে যাবে, যাচ্ছেও। আপনি কেবল আমাদের শক্তি দেবেন, অনুপ্রাণিত করবেন, আশীর্বাদ করবেন। আমরাই সব কাজ করব। যেখানেই থাকি না কেন, মহারাজ, আপনি আছেন এই ভেবেই আমাদের প্রাণে যে কত বল আসে তা আর কি বলব!

মহাপুরুষজী—তোমরা আমায় খুব ভালবাস, শ্রদ্ধাভক্তি কর, তা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। প্রভুর সঙ্ঘের এই যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা—এই হলো সঙ্ঘের জীবনীশক্তি। যতদিন পরস্পরের প্রতি এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সঙ্ঘের একতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কারণ, এই যে প্রেমের সম্বন্ধ তা ঠাকুরকে নিয়ে। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। আর সঙ্ঘাচার্যগণের যে শক্তি এ সঙ্ঘের ভিতর কাজ করছে তাও কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এই দেখ না স্বামীজী, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ—এঁরা একে একে দেহ ছেড়ে চলে গেলেন; কিন্তু তাই বলে তাঁদের উপর আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তা কি কমেছে, না তাঁদের আধ্যাত্মিকশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, না কখনো হতে পারে? তা নয়। তাঁরা এখনো আছেন এবং তাঁদের শক্তিও ঠিক তেমনি কাজ করছে বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে। তাঁদের জীবন এখনো আমাদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিচ্ছে এবং ঠিক পথে চালিত করছে। এখন তাঁরা চিন্ময় দেহে রয়েছেন এবং সূক্ষ্মভাবে আরো বেশি কাজ করছেন। এখনো তাঁদের দেখা যায়। আর স্থূল শরীরে থাকতে যেমন ভাবে কাজকর্মের নানা উপদেশ বা আভাস দিতেন, এখনো প্রয়োজন হলে তেমনি দিয়ে থাকেন। মন সমাধিস্থ হয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যখন ঐসকল মহাপুরুষদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে এমন কি পথের নির্দেশও পাওয়া যায়। আমাদের দেহ নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁতে গিয়ে মিশব। তখন ঠাকুরকে চিন্তা করলেই আমাদেরও চিন্তা করা হবে। আমরা তাঁর ভক্ত, তাঁর দাস, তিনি ছাড়া আমাদের পৃথক সত্তা আর কিছু নেই। আমাদের ব্যক্তিত্ব তাঁতে লীন হয়ে গেছে। আর ঠাকুরই হলেন সনাতন পরব্রহ্ম।

সন্ন্যাসী—আমরা তো, মহারাজ, স্থূল জগতে আছি—আমরা আপনাকে স্থূলভাবেই পেতে চাই। তা ছাড়া আমাদের মনও অত উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে নি। ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। আপনি ঠাকুরের পার্ষদ, তাঁর অন্তরঙ্গ। তাঁরই প্রতিনিধিরূপে আমাদের সামনে রয়েছেন। আমরা আপনার ভিতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করছি। আপনার কাছে প্রার্থনা জানালেই মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে পৌঁছে গেল।

মহাপুরুষজী—তা আমাদের শরীর গেলেও তোমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা কখনো যাবে না। আমি খুব আশীর্বাদ করছি—তোমরা খুব বেড়ে যাও, ভক্তি-বিশ্বাস প্রেম-পবিত্রতায় তোমাদের হৃদয় ভরে যাক, জগতের বহুবিধ কল্যাণ তোমাদের দ্বারা সাধিত হোক। ঠাকুর তোমাদের ঠিক চালিয়ে নেবেন, খুব শক্তি দেবেন। ঠাকুর, স্বামীজী এঁরা এসেছিলেন জগতের হিতের জন্য। নতুন আধ্যাত্মিক আলো দিয়ে সমগ্র জগৎকে শান্তির ক্রোড়ে টেনে নেবেন বলেই তো শ্রীপ্রভুর নরদেহধারণ। আর তাঁর সেই যুগপ্রবর্তনের জন্যই স্বামীজী এ সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজী যে আদর্শ প্রচার করে গেছেন, সমগ্র জগৎকে সে আদর্শ ক্রমে গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র জগতে শান্তিস্থাপনের আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

## বেলুড় মঠ

### ১২ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৫ (২৬ মার্চ, ১৯২৯)

বিকালবেলা পাঁচটার পর মহাপুরুষজী ঘরের ভিতর খুব গরম বোধ হওয়ায় বাহিরে আসিয়াছেন এবং পূর্বদিকের বারান্দায় আরাম-কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামীজীও সেদিন মঠে আসিয়াছেন, সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী সেবক। সেবকটি প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী তাহার সঙ্গে পূজনীয় অভেদানন্দজীর সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সেবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনার শরীরটা একটু ভাল বোধ করছেন কি আজকাল? মহাপুরুষজী হাসিয়া উত্তর দিলেন—না, এ বৃদ্ধ শরীর কি আর ভাল হবে? তুমিও যেমন। এই করে যে কয়টা দিন কেটে যায় ঠাকুরের ইচ্ছায়।

সেবক—ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের পার্ষদরা তো সকলেই চলে যাচ্ছেন; এখন আপনারা যা দু-এক জন আছেন। আপনারও তো এই শরীর! আবার কবে আসছেন আপনারা কে জানে? ঠাকুর না এলে তো আপনারাও আসবেন না।

মহারাজ—তা কে জানে বাপু! ঠাকুরের আরো কত ভক্ত আছেন। আমাদেরই যে আনবেন এমন কি কথা আছে?

সেবক—আপনারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনাদেরও সঙ্গে সঙ্গে আসতে হবে।

মহারাজ—তার কি ঠিক আছে? এসব individuality (ব্যক্তিত্ব) নশ্বর; এ জগৎও অনিত্য, অবশ্য প্রবাহাকারে নিত্য। একমাত্র ভগবানই সত্য। তিনি চিরকাল আছেন, এবং যুগে যুগে জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহধারণ করে থাকেন। সে কেবল তাঁর অহৈতুকী কৃপা। তিনি নিজে পূর্ণ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তাঁর এ দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন

নেই। তাঁর প্রাপ্যও কিছু নেই, অপ্রাপ্যও কিছু নেই, কারণ তিনি নিজে পূর্ণ। তবু যখন এ জগৎ পাপভারাক্রান্ত হয়, জগতে অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন সেই পরম কারুণিক ভগবান পতিতদিগকে ত্রাণ করবার জন্য স্বেচ্ছায় নরদেহধারণ করেন এবং জগতের দুঃখকষ্ট দূর করেন। দেখ না, ভগবান গীতাতেই বলেছেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।'—ইত্যাদি

—'হে পার্থ, ত্রিজগতে আমার কোন কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্তও কিছু নেই—যা আমাকে নতুন করে পেতে হবে। তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত হই।' কেন হন? না, তিনি যদি কর্ম না করেন তো মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে তাঁরই অনুসরণ করবে এবং তার ফলে এ লোকসকল উৎসন্ন যাবে, বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে, আরো কত প্রকারের অনর্থ ঘটবে। ভগবান জানেন যে এ জগৎ অনিত্য। তবু জেনে শুনেও এই জগতের কল্যাণের জন্য তিনি কত কষ্ট স্বীকার করেন! ঠাকুরের জীবনেই দেখ না, তিনি সাধারণ মানুষের মতো সব ব্যবহারাদি করতেন। কিন্তু তাঁর ঐ চৌদ্দপোয়া দেহের ভিতর বিরাজ করতেন পূর্ণ ঈশ্বর। বাইরে নরাকার, কিন্তু ভিতরটা বিরাট ভগবান।

## বেলুড় মঠ

১৩ চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৫ (২৭ মার্চ, ১৯২৯)

মহাপুরুষজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই জনৈক সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'আভী কফ-বায়ুনে ঘেরা' (এখন কফ ও বায়ুতে ঘিরেছে)। কোন্ দিক সামলাই বল? এদিক করতে যাই তো ওদিক খারাপ হবে—সর্দির দিক দেখতে গেলে বায়ু বেড়ে গেল। এই করে কি বেশি দিন শরীর থাকা ভাল? তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি!

সেবক—না, মহারাজ, আমাদের কি কষ্ট? আপনিই তো আমাদের বাপ, মা, সব। এখন আপনার শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, আমরা একটু সেবা করব না? আপনার যে একটু সেবা করবার অধিকার পেয়েছি, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

মহারাজ—তা তোমরা যে ভালবেসে সব কর, এ আমি খুব জানি। তবু কি জান, এই করে ভুগে ভুগে শরীরধারণ করতে আমার তো, বাবা, ইচ্ছা হয় না। তা সবই ঠাকুরের ইচ্ছা; তিনি যখন যেমন রাখেন তেমনই থাকতে হবে।

সেবক—মহারাজ, আমরা ঠাকুরকে দেখি নি। আপনি আছেন, এতেও আমাদের কত আনন্দ! আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনার কাছে থাকতে পেয়েছি, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আছেন, তাই এত সাধুসন্ন্যাসী ও কত ভক্ত, সকলেরই

ভরপুর আনন্দ। আমি তো এক এক সময় ভাবি, কত লোক দূর দূর থেকে টাকা পয়সা খরচ করে, কত কষ্ট স্বীকার করে আসে শুধু একটিবার আপনাদের দর্শন করতে! আর আমাদের এমনই সৌভাগ্য যে সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকতে পেয়েছি।

মহারাজ খুবই আবেগভরে বলিলেন—ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তোমাদের উপর। তাই তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা। তোমরাও ধন্য আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত? অবশ্য ঠাকুর আমাদের সর্বক্ষণই দেখছেন। আমাদের মহারাজ দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তাঁর সেবকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'তোরা আমার সেবা করেছিস, কি আর বলব, তোদের সব ব্রহ্মজ্ঞান হোক।' আমিও বলছি, বাবা, তোমাদের সব ব্রহ্মজ্ঞান হোক, পূর্ণ ভক্তিবিশ্বাসলাভ হোক, তোমরা সব আনন্দে থাক। এইমাত্র বলিয়া মৌনভাবে খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

* * *

মহাপুরুষজীর শরীর অসুস্থ। এখন আর তিনি সব দিন ঠাকুরঘরে গিয়া দীক্ষাদি দিতে পারেন না। অনেক সময় নিজের ঘরে, এমন কি বিছানায় বসিয়াই দীক্ষাদি দেন। বিকালে প্রায় সাড়ে-চারটার সময় মাদ্রাজের একটি ভক্ত আসিয়া প্রণামপূর্বক দীক্ষা লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—আচ্ছা হবে, তোমার দীক্ষা কালই হবে। কি বল?

ভক্তটি বলিলেন—মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

মহারাজ—তা এখন দিলেও হয়। ঠাকুরের নাম দেব, যখন ইচ্ছা হবে তখনই দেব, অত কালাকাল-বিচার নেই। আমাদের ঠাকুর পতিতপাবন, পতিতের উদ্ধারের জন্যই তিনি নরদেহ ধারণ করে এসেছিলেন। আমরা তাঁর দাস, তাঁর সন্তান। যতক্ষণ শরীর থাকবে ততক্ষণ লোককে সেই তারকব্রহ্মনাম দিয়ে যাব। আমাদের দীক্ষা তো আর বামুন ভট্‌চায্যির দীক্ষা নয়। আমরা ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কিছুই জানি নে। আমরা জানি—যিনি রাম ছিলেন, কৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। সমস্ত ভাবের, সমস্ত দেবদেবীর ঘনীভূত মূর্তি হলেন ঠাকুর।

## বেলুড় মঠ

২৫ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৫ (৮ এপ্রিল, ১৯২৯)

বেলা প্রায় সাড়ে-এগারটা। মহাপুরুষজী স্নান করিয়া স্নানের ঘর হইতে আসিতেছেন। কেদার বাবা প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। মহাপুরুষজী ঘরে আসিলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজীও হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—জয় কেদার বাবা, জয় অচলানন্দ স্বামী। তৎপরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন—জয় প্রভু, জয় ঠাকুর, দীনশরণ প্রভু। এই বলিতে বলিতে আহার করিবার আসনে বসিলেন। একটু পরে বলিলেন—ঠাকুর, আমাদের শুদ্ধা ভক্তি দাও, লোকদেখানো ভক্তি দিও না। লোকদেখানো ভক্তি নিয়ে কি হবে? পরম দয়াল তিনি, তাঁর কাছে যে যা চায় তিনি তাকে তাই দেন।

এই বলিয়া কেদার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আগে নারায়ণকে নিবেদন করি। এই নাও প্রসাদ। তুমি নারায়ণ, তোমার সেবা আগে হোক। বলিতে বলিতে নিজের খাবারের থালা হইতে অগ্রেই ভাল ভাল জিনিস তুলিয়া কেদার বাবার হাতে দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—এইসব ঠাকুরের প্রসাদ, আগে নারায়ণকে দিয়ে পরে খেতে হয়। স্বামীজী কখনো কখনো নিজের হাতে রান্না করতেন। তাঁর একটি ছোট্ট ঘটি ছিল, হিন্দুস্থানীদের মতো। তাতে ডালভাত রান্না করতেন। পরে ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করে আমাদের সব আগে প্রসাদ দিতেন, তারপরে নিজে খেতেন আর বলতেন, 'আগে নারায়ণের সেবা, তারপর নিজের খাওয়া।'

কেদার বাবা প্রসাদ লইয়া চলিয়া যাইবার পর মহাপুরুষ মহারাজ আহারে বসিলেন। নিকটে জনৈক সেবক বসিয়াছিল। কথায় কথায় মঠের একজন সাধু গ্রামে মাধুকরী করিয়া খাইতেছেন, সে কথা উঠিল। তাহাতে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—আমরাও এক সময়ে এখানে মাধুকরী করে খেয়েছি। সে অনেক দিনের কথা। স্বামীজী তখন মঠে নিয়ম করেছিলেন যে ভোর চারটার সময় ঘণ্টা মারা হবে। সকলকে তখন ঘুম থেকে উঠে শৌচাদি সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করতে হতো। স্বামীজী নিজেও যেতেন। আর যে না যেত সে সেদিন আর মঠে খেতে পেত না; তাকে মাধুকরী করে খেতে হতো। আমরা সকলেই উঠে ঐ সময় ধ্যান করতাম। এক এক দিন এমনও হয়েছে যে, ঘণ্টা শুনতে পাই নি। তখন সকালবেলা স্বামীজী বলতেন—'আমরা নিজেরা যদি এ নিয়ম না মানি তবে ছেলেরা কি করে মানবে?' তাই আমাদেরও বলতেন—'যাও মাধুকরী করে খাও গে।' ঐভাবে এক-আধ দিন আমিও এখানে মাধুকরী করে খেয়েছি।

বিকাল প্রায় সাড়ে-পাঁচটার সময় মহাপুরুষজী ঘরে বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি ছোকরা ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিয়া মেঝেতে উপবেশন করিল। মহাপুরুষজী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলেন—তুমি কি এখান হতে দীক্ষাদি নিয়েছ?

ভক্ত—আজ্ঞে হ্যাঁ, গত শ্রাবণ মাসে দীক্ষা নিয়েছি।

মহারাজ—তা বেশ। জপ-ধ্যান কর তো? এখান হতেই দীক্ষা নাও আর যাই কর, তাঁর নাম করতে হবে, তবেই আনন্দ পাবে। আর কাতরভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, 'ঠাকুর, আমায় ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আর ভুলিয়ে রেখো না।' তাঁর নাম জপ করবে এবং খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে যতক্ষণ সময় পাও। না করলে, বাবা, কিছুই হবে না।

ভক্ত—আগে আগে খুবই করতাম, কিন্তু এখন দিন কতক ধরে সময় করে উঠতে পাচ্ছি না, তাই অল্প অল্প করি।

মহারাজ—তা বেশ, কিন্তু ধ্যান-জপ যতক্ষণ করবে খুব অনুরাগের সহিত, খুব প্রেমের সহিত করবে। দশ-কুড়ি মিনিট কর সেও ভাল, কিন্তু সেটুকু সমস্ত প্রাণমন ঢেলে করতে হবে। তিনি তো অন্তর্যামী, তোমার ভেতরেই রয়েছেন—তিনি দেখেন প্রাণ। তোমার অনুরাগ দেখবেন, তিনি তো আর সময় দেখবেন না? দিনান্তে যখনই সময় পাবে, প্রাণভরে তাঁকে ডাকবে। কাতরভাবে প্রার্থনা করবে—'প্রভু, এই সংসার-বিপাকে পড়ে যেন তোমায় না ভুলি।' এ সংসার তো দু-দিনের। এ মায়ার সংসারে পড়ে তাঁকে যেন ভুল না হয়। শত কাজ কর, ক্রোড় ক্রোড় টাকা উপার্জন কর, কিন্তু প্রাণে এইটে ঠিক জানবে যে, এ সবই অনিত্য, এ সবই একদিন ছেড়ে যেতে হবে। একমাত্র নিত্য বস্তু হলেন ভগবান। তুমি শ্রীপ্রভুকেই ডাক, তাঁরই শরণাপন্ন হও। সব বন্ধন কেটে যাবে, বাবা।

ভক্ত—আপনি আশীর্বাদ করুন, তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহারাজ—আশীর্বাদ তো করছিই, খুব আশীর্বাদ করছি। আমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর কি আছে? আশীর্বাদ করি বলেই তো এই সব বলছি। ঠাকুরকে ডাক, তাঁর শরণাপন্ন হও। ঠাকুর আমাদের জীবন্ত জাগ্রত রয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে ডেকেই দেখ একবার, তিনি তখনই সাড়া দেবেন। বহু লোকের কল্যাণের জন্যই ভগবান—যিনি পরব্রহ্ম তিনি এই রামকৃষ্ণরূপ ধরে এই যুগে এসেছেন। তুমি যখন সেই যুগাবতারের আশ্রয়ে এসেছ, তখন আর ভাবনা কি?

ভক্ত—আপনাকে লজ্জায় ও ভয়ে একটা কথা এতদিন জানাই নি! কিছুদিন পূর্বে আমি বিয়ে করেছি। বাবা-মার কান্নাকাটিতে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

মহারাজ—তাতে হয়েছে কি? জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তিন ব্যাপারে মানুষের কিছুই হাত নেই। এ বিধাতার নিয়ম। বিবাহ করেছ বলেই যে তাতে আসক্ত হয়ে পড়তে হবে তার কি মানে আছে? বেশ তো, তুমি তোমার কাজকর্ম কর। নিজের সাধ্যমত সাধন-ভজন কর; স্ত্রীও তাই করবে। তারও তো জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। ভোগবিলাসের জন্য তো আর এ জীবন নয়। তুমিও ভগবানের সৃষ্ট জীব, সেও তাই। তুমিও ভগবানের অংশ, সেও জগদম্বার অংশ। তুমি যেমন জীবন যাপন করছ তাকেও তাই শেখাবে। সেও ভগবানের নাম করবে, পূজা পাঠ করবে, সংসারের কাজকর্ম করবে, গুরুজনদের সেবাশুশ্রূষা করবে। তাকেও এই সব শেখাও, তবে তো। তা না করে যদি তাকে কেবল দেহের ভোগবিলাসের জন্য ব্যবহার কর, তবে বলব ছ্যা! ওতে আসক্ত হয়ে পড়ো না, বাবা। কাম-কাঞ্চন মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে ফেলে।

ভক্ত—আমার এই ভরসা যে আপনার যখন আশীর্বাদ পেয়েছি এবং ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসেছি, তখন সবই ঠিক থাকবে।

মহারাজ—মোট কথা, জীবনের লক্ষ্য যেন ভুলে না যাও। জীবনটা দু-দিনকার অনিত্য, ভোগবিলাসের জন্য নয়—এইটে খুব স্মরণ রাখবে। এখন একটু ঠাকুরঘরে যাও তো। ঠাকুর প্রণাম করে তাঁর ধ্যান কর, তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমায় শান্তি দেবেন।

## বেলুড় মঠ

২৭ চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৫ (১০ এপ্রিল, ১৯২৯)

আহার করিতে করিতে মহাপুরুষজী বলিতেছেন—আমার ভাতে-ভাত খেতেই ভাল লাগে, ওতেই আনন্দ। আর এই যে সব দেখছ, (সুক্তোর ঝোল দেখাইয়া) ওসব ওষুধের মতো খাই। পটল-ভাতে দিয়া খাইতে খাইতে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—আর বাস্তবিক পক্ষে আহারটা ওষুধই। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—'ক্ষুদ্-ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং, প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্।'—ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর। ক্ষুধাটাও একটা ব্যাধি। ওষুধে যেমন ব্যাধির উপশম হয়, ক্ষুধারূপ ব্যাধিরও তেমনি আহারে উপশম হয়। এই ভেবে আহার করতে হয়। শঙ্করাচার্য মহাজ্ঞানী, তাই তিনি ওরূপ বলে গেছেন। আত্মার তো আর ক্ষুধাদি বলে কিছু নেই, তিনি তো নির্বিকার, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। ক্ষুৎপিপাসাদি তো পরমাত্মার ধর্ম নয়, ও হলো দেহের ধর্ম।

## বেলুড় মঠ

৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৬ (১৮ এপ্রিল, ১৯২৯)

বিকাল প্রায় পাঁচটা হইবে। জনৈক সন্ন্যাসী প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কিছু বলবে? এমন সময় উক্ত সন্ন্যাসী বড় একটা আসেন না, তাই এই প্রশ্ন।

সন্ন্যাসী—আজ্ঞে, কাল মাস্টার মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথা সব বললেন।

মহারাজ—আহা! তিনি ঠাকুরের মহাভক্ত। ঠাকুরের কথা ছাড়া তাঁর কাছে আর অন্য কোন কথা পাবে না।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, মনে মহা অশান্তি। সাধন-ভজন তো কিছুই করতে পারলুম না, এদিকে দিন তো বয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপায় কি হবে?

মহারাজ—বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। জপ-ধ্যান করে কি তাঁকে ধরতে পারে মানুষ? তিনি যদি দয়া করে ধরা দেন তবেই, নইলে তাঁকে পাবার আর জো নেই। কার সাধ্য যে তাঁকে ধরে? সাধন-ভজন মানুষ কতক্ষণ করবে? দু-ঘণ্টা, চার-ঘণ্টা কি জোর আট-দশ ঘণ্টা। আর সেই সাধনার প্রবৃত্তিও তিনিই দেন। সব শক্তির আধার যে তিনি! তাঁর দয়া না হলে, তিনি শক্তি না দিলে, কি করে সাধন-ভজন করবে? তাই বলছি, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। আর কাতরভাবে প্রার্থনা কর—'প্রভু, কৃপা কর, কৃপা কর।' তবেই তিনি কৃপা করবেন। কৃপা, কৃপা, কৃপা। ঠাকুর বলতেন—'তুমি, তোমার; আমি, আমার নয়।' আমরা কি করতে পারি, তিনি যদি দয়া করে না ধরা দেন? দয়া, দয়া। দয়া কর, প্রভু!

সন্ন্যাসী—প্রার্থনাও যে করতে পারছি নে, মহারাজ! চঞ্চল মন, সব সময় মন স্থির হয় না।

মহারাজ—না, প্রার্থনা করতে হবে খুব ব্যাকুল হয়ে। মনে নৈরাশ্যের ভাব এনো না। দুঃখ করো না। আনন্দ কর, আর প্রার্থনা কর! তিনি সব দেবেন, বাবা, সব দেবেন। তোমাদের তাঁর অদেয় কিছুই নেই। ভক্তি বল, বিশ্বাস বল, ত্যাগ, পবিত্রতা, বিবেক, বৈরাগ্য সবই তিনি দেবেন। তাঁর যা কিছু ছিল সবই তোমাদের দেবেন। দেবেন বলেই তো তিনি তোমাদের জন্য এসেছিলেন। দেবেন বলেই তো তোমাদের তিনি এখানে এনেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয়ে রেখেছেন। এখানে কি তোমরা নিজেরা এসেছ? কখনোই না। ওভাব মনে একেবারেই স্থান দিও না। তিনি কৃপা করে তোমাদের সব টেনে এনেছেন। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু তিনি। বাবা, পড়ে থাক, সব হবে, কালে সব হবে। আমরা বলছি, সব পাবে। ভক্তি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে দেবেন। এই বলিয়া নিজেই গান ধরিলেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।<br>
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।'

তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে আছ, তোমাদের ভয় কি?

## বেলুড় মঠ

১৭ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ (৩০ এপ্রিল, ১৯২৯)

বিকালবেলা মুঙ্গেরের উকিল শ্রীগঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ও বাড়ির আরো কয়েকজন ভক্তসহ আসিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া গঙ্গাচরণবাবু বলিলেন—আপনার শরীর যে খুব খারাপ হয়ে গেছে, মহারাজ! গত বৎসর যা দেখেছিলাম তার তুলনায় এখন যে ঢের খারাপ দেখছি।

মহারাজ—হাঁ, শরীর খুবই খারাপ। এখন দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। আর ষড় বিকারাত্মক শরীর, এখন শেষ বিকারের অবস্থা চলছে। ও তো হবেই। দেহের ধর্মই ঐ। সব শরীরেরই একদিন বিনাশ নিশ্চয়।

গঙ্গাচরণবাবু—প্রত্যেক চিঠিতেই খবর পাচ্ছিলাম যে আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই এবার দেখতে এসেছি, বড় ইচ্ছা হয়েছিল।

মহারাজ—(হাসিতে হাসিতে) বাইরের দেখা-শুনায় আর কি আছে বলুন। ভিতরের দেখাই দেখা। আর সেই ভগবান তো সকলের অন্তরেই রয়েছেন। তাঁ থেকেই এ সমস্ত জগতের উদ্ভব হয়েছে।

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।'

—'ইহা হতেই প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং সকল বস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হয়।' এই সমস্ত ভূত, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—সবই তাঁ থেকে এসেছে। আর তিনিই হলেন সকলের নিয়ন্তা। 'ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ' ইত্যাদি। —ইহারই ভয়ে সূর্য তাপ দিতেছে। আবার তাঁতেই সব লয় হয়ে যাবে। 'তজ্জলান্'—এই জগৎ তাঁহা হতেই উৎপন্ন হয়, তাঁতেই লয় পায়, এবং তাঁতেই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এ তো আছেই, জন্ম-মৃত্যু এ তো কেউ রোধ করতে পারবে না। একমাত্র ভগবানই হলেন অজর, অমর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তাঁকে ভিতরে উপলব্ধি করাই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। সেইটে হয়ে গেলেই সব হলো। তারপর দেহ থাক আর যাক। আর তিনি তো আমাদের অন্তরাত্মারূপেই রয়েছেন। সর্বভূতের পরমাত্মা, সেই অমৃতধাম সকলেরই ভিতর রয়েছেন, কেবল সেইটুকুই জানতে হবে।

গঙ্গাচরণবাবু—মহারাজ, একটা প্রশ্ন মনে উঠেছে। মৃত্যুর পরে কি সকলকেই প্রেত শরীর ধারণ করতে হয়?

মহারাজ—তা কেন? যারা ভগবদ্ভক্ত, ঠিক ঠিক ভক্তিলাভ করেছে, যাদের পরম জ্ঞান হয়েছে, তাদের প্রেতশরীর ধারণ করতে হবে কেন? তারা সব ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়—মুক্ত হয়ে যায়।

গঙ্গাচরণবাবু—তবে এই যে সব শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে তার মানে কি? সকলেরই তো শ্রাদ্ধাদি, বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি করতে হয়।

মহারাজ—হাঁ, তা করতে হয়। ও সাধারণ নিয়ম, সকলেই মেনে চলে। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে, যেমন আপনার স্ত্রীর বেলায়, ওসব করতেও পারেন, না করলেও কোন ক্ষতি নেই। তিনি মহা ভক্তিমতী ছিলেন; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। আপনার স্ত্রীর দেহত্যাগের পর আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, তিনি কৈলাসধামে চলে গেলেন। তাঁর মহা উচ্চগতি হয়েছে। সেজন্য আপনি নিশ্চিত থাকুন।

মহাপুরুষজীর আশ্বাস-বাণী-শ্রবণে ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া গঙ্গাচরণবাবু হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সজলনয়নে করজোড়ে মহাপুরুষজীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—মহারাজ, আমাকে একটা ভিক্ষা দিতেই হবে। আমায় এই করে দিন যেন মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ হয়, আর তাঁর শ্রীচরণে যেন অন্তে স্থান পাই। এই বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষজী গঙ্গাচরণবাবুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—বাবা, তোমার তাই হবে (এখন আর 'আপনার' সম্বোধন নাই), তোমার ভক্তিবিশ্বাস আছে এবং আরো হবে। খুব আশীর্বাদ করছি, তোমার খুব ভক্তিবিশ্বাস হোক। আমি বলছি, বাবা, তোমার খুব হবে, তোমার উপর মার খুব কৃপা আছে।

গঙ্গাচরণবাবু—আপনি বললেই হবে। মা আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন। আপনি আমার বল, ভরসা সব।

মহারাজ—মা আমাদের কথা তো শুনবেনই, তোমার কথাও শুনবেন। যে সরল প্রাণে কাতরভাবে তাঁকে ডাকে, তিনি তাঁর কথাই শোনেন। দয়া, দয়া। তাঁর দয়া ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। জয় প্রভু, জয় করুণাময় ঠাকুর।

গঙ্গাচরণবাবু মহাপুরুষজীর আশীর্বাদলাভে আশ্বস্ত হইয়া অন্য দু-চার কথার পর এইবার বিদায় লইবেন। একে একে সকলে প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন। গঙ্গাচরণবাবুর মেয়েটি প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। মহারাজ খুব করুণস্বরে বলিতেছেন—খুব শান্তিতে থাক, মা। তোমার স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই খুব সুখে থাকুক। সংসারে তো সুখ নেই। দুঃখ-কষ্টের তুলনায় সুখ খুবই অল্প। তবে এরই মধ্যে যারা সংসারে ভগবদ্ভক্ত হয়ে থাকে তারা কতকটা শান্তিতে থাকতে পারে। দুঃখ কষ্ট যাই আসুক না কেন, তাতে তারা বিচলিত হয় না। কারণ তারা জানে যে সবই ভগবানের দান। যে ভগবান সুখ দিচ্ছেন, তিনি আবার দুঃখ কষ্টও দিচ্ছেন। তাই সবই শ্রীভগবানের আশীর্বাদ জ্ঞানে নীরবে সহ্য করতে পারে। তারা সুখেও উৎফুল্ল হয় না, আর দুঃখেও অধীর হয়ে পড়ে না। সংসারে সুখও যেমন অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখও তেমনি অনিত্য। ওসব আসে, আবার চলে যায়। কিছুই থাকে না। একমাত্র নিত্যবস্তু, একমাত্র শান্তির আলয় হলেন শ্রীভগবান। তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, মা, তবেই জীবনে শান্তি পাবে।

একটি ছোট কুমারী মেয়ে প্রণাম করিলে মহারাজ তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—এ সবই মা। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।'—জগতে বিবিধ শক্তিযুক্ত সকল স্ত্রীই তোমার বিভিন্ন রূপ।

সন্ধ্যার অনতিপূর্বে একটি স্ত্রীভক্ত প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনার শরীর কেমন আছে?

মহারাজ—শরীর ভাল নয়, মা। এ বৃদ্ধ শরীর। এ কি আর ভাল হয়?

স্ত্রীভক্ত—খাওয়া দাওয়াও খুব কমে গেছে?

মহারাজ—হাঁ, ঐ সামান্য ঝোল-ভাত দুপুরে, আর রাত্রে একটু দুধ। এর বেশি হজমও হয় না, আর খাওয়ার কোন প্রবৃত্তিও হয় না। এটা ওটা খাব, এমন ইচ্ছাই হয় না। খাওয়া দাওয়ার দরকার তো শরীর ধারণের জন্য। তাই একটু একটু আহার দিতে হয়, যাতে শরীরটা যতদিন থাকে ভগবানের স্মরণ-মনন করতে পারি। ভগবানের ধ্যান চিন্তা করা ছাড়া অন্য কোন বাসনাও নেই। ঠাকুরকে হৃদয়ে দেখতে পেলেই আনন্দ। এ সংসার দু-দিনের জন্য। পিতা বল, মাতা বল, ভাই বন্ধু সখা—সবই অনিত্য।এ সংসার যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে, একমাত্র অন্তরাত্মা যিনি, তিনিই সর্বকালে আছেন ও থাকবেন। তিনিই নিত্য।

স্ত্রীভক্ত—মহারাজ, আমাদের গতি কি হবে? আমরা তো মায়াবদ্ধ জীব। এ সংসারটাকেই আমার আমার বলে মরছি, কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। এত দুঃখ কষ্ট পাই, তবু ভুলতে পারছি না।

মহারাজ—গতি একমাত্র ভগবান, তাঁর শরণাগত হও। তিনিই সর্বস্ব। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব' ইত্যাদি। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, সখা, তিনিই সব। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক, তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। এই দুঃখময় সংসারে একমাত্র সুখ তাঁতেই আছে। ঠাকুর যেমন বলতেন—'উটের কাঁটাঘাস খাওয়া।' সংসারী জীবের এ সংসারে সুখও ঠিক তেমনি। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবে না, মা।

অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—সংসারটাকে অনিত্য বোধ করা কি চারটিখানি কথা? এ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। খুব কাঁদ আর প্রার্থনা কর, তবেই তাঁর কৃপা হবে। তিনি তো তোমার ভিতরেই রয়েছেন। কৃপা করে মায়ার আবরণ যখন কেটে দেবেন তখনই তাঁকে দেখতে পাবে। কৃপা, কৃপা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

## বেলুড় মঠ

১৮ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৩৬ (১ মে, ১৯২৯)

একটি যুবকের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য হওয়ায় বি. এ. পরীক্ষা না দিয়াই সাধন-ভজন করিবার জন্য সে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায়, কিন্তু অভিভাবকগণ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনে এবং বাড়িতে থাকিয়াই ভগবানের ধ্যান-ভজন করিতে বলে। সেই অবধি সে মহাপুরুষজীর উপদেশমত বাড়িতে থাকিয়াই সাধন-ভজন করিতেছে। যুবকটি আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গো, কেমন আছ?

শরীর ভালই আছে, মহারাজ, কিন্তু মন ভারি চঞ্চল। মনে কোন শান্তি পাই নে, মহা অশান্তি।

মহারাজ—এই যে তোমার মনে অশান্তির ভাব এসেছে, এতেই জানবে যে মা তোমায় কৃপা করছেন। তাঁকে পাবার জন্য যে ব্যাকুলতা, তাঁকে পাচ্ছ না বলে মনে যে অশান্তি এসেছে, এটি তাঁর কৃপার লক্ষণ। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এবং ভগবৎকৃপায় মানুষের মনে মুমুক্ষুত্ব আসে। এখন খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদ আর প্রার্থনা কর—'মা, দেখা দাও। আমি সাধনহীন, ভজনহীন, দুর্বল, কৃপা করে দেখা দাও।' কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না, কেবল ডেকে যাও। মন বসুক আর নাই বসুক, ডাকতে ছাড়বে না। লেগে থাক, পড়ে থাক খানদানী চাষার মতো। তবেই তাঁর কৃপা হবে। তাই তো বলছি, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? ঐ বাড়িতে বসেই মাকে ডাক। ঐখান থেকেই মা কৃপা করে তোমার প্রাণে সংসারের অনিত্যত্ব-বোধ এনে দেবেন, সংসারবন্ধন কেটে দেবেন।

যুবক—কখনো কখনো ধ্যান করে খুব আনন্দ পাই, আবার কখনো মন একেবারেই বশে আনতে পারি নে।

মহারাজ—মনের স্বভাবই ঐ রকম, wave-like motion—ঢেউয়ের মতো গতি। ঢেউ দেখ নি? এই জল খুব উঁচু হয়ে ঢেউ এলো, সেই উত্থানের পেছনেই আবার প্রকাণ্ড পতন। তারপর আবার উঁচু ঢেউ। এই তো চলেছে। ঐ যে এক একবার control-এর (আয়ত্তের) বাইরে চলে যায় মন, তার মানে আবার প্রকাণ্ড ঢেউ আসবে, মন উঁচুতে উঠে যাবে, তখন খুব আনন্দ পাবে। তবে যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা ঐ আনন্দেও আত্মহারা হবে না, আর নিরানন্দেও হতাশ হয়ে পড়বে না। সবই মায়ের ইচ্ছা—মায়ের কৃপা জেনে সমানভাবে মাকে ডেকে যাবে—মা যখন যে অবস্থায় রাখেন। এই করতে করতে তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—মার পূর্ণ প্রকাশ হবে। তুমি কিছুতেই বিচলিত হয়ো না, বাবা। মা তোমায় কৃপা করছেন, আরো করবেন, আমি বলছি।

চুলগুলি অত বড় রেখেছ কেন? ও চুল কেটে ফেল। ওতে লোক-দেখানো ধর্ম হয়ে যাবে। দশ জন যেমন থাকে, তুমিও তেমনি থাকবে। বাইরে কোন পার্থক্য থাকবে না। ভিতরে ভিতরে মাকে ডাকবে। তিনি কি আর বাইরের জিনিস গা? এখন একটু ঠাকুরঘরে যাও, ঠাকুর দর্শন কর, তারপর একটু প্রসাদ নাও।

### বেলুড় মঠ

২১ বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩৬ (৪ মে, ১৯২৯)

মহাপুরুষ মহারাজ নিজ ঘরে কয়েকজন ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন এবং আনন্দে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। এমন সময় মহাপুরুষজীর কৃপাপ্রাপ্ত একটি বালিকাভক্ত তাহার মাকে সঙ্গে নিয়া মহাপুরুষজীকে দর্শন করিতে কলিকাতা হইতে

আসিল। মেয়েটির বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর, স্কুলে পড়ে। মাতা ও কন্যা দু-জনেই মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে প্রণামানন্তর সকাতরে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। পরে মেয়েটির মা খুব বিনীতভাবে বলিলেন—একে আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে এর ভক্তিবিশ্বাস খুব হয়। আমার তো ইচ্ছা যে, একে বে দেব না। ঠাকুরের নাম করবে, আর আনন্দে থাকবে। বাবা, সংসারে বড় জ্বালা। আমি নিজে তো ভুক্তভোগী! সংসারে যে কি সুখ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, তাই আর নিজে জেনে-শুনে মেয়েটিকে সংসার-দাবানলে ফেলতে মন চায় না; আপনি একে একটু আশীর্বাদ করুন।

মহাপুরুষজী—খুব আশীর্বাদ করছি, মা, খুব আশীর্বাদ করছি।

পরে মেয়েটির দিকে সস্নেহে তাকাইয়া বলিলেন—ঠাকুরকে খুব প্রাণভরে ডাক্—আর পবিত্র থাক্। ঠাকুরই পিতা, মাতা, পতি, সখা—সবই ঠাকুর।

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।'[১]

এখন তো পাঠ্যজীবন, মন দিয়ে পড়াশুনা কর, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের যে নাম পেয়েছ তা জপ কর। পড়াশুনা কর আর যাই কর, মা, জীবনের উদ্দেশ্য হলো ভগবানলাভ। সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। এ সংসার তো দু-দিনের—ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র নিত্যবস্তু হলেন ভগবান। খুব পবিত্রভাবে থাকবে। সরল, পবিত্র হৃদয়ে ভগবান শীঘ্র প্রকাশিত হন। পবিত্রতা হলো ধর্মজীবনের একমাত্র ভিত্তি।

মা-ঠাকরুনের জীবনী পড়েছ? এ যুগের সমগ্র নারীজাতির আদর্শ হলেন তিনি। তাঁর জীবন অতি অদ্ভুত। নরদেহ ধারণ করে সাধারণ গৃহস্থের বধূর মতো থাকতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী। শাস্ত্রে যে কালী, তারা, ষোড়শী ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার[২] কথা উল্লেখ রয়েছে, মা-ঠাকরুন ছিলেন সেই দশমহাবিদ্যার একজন। ঠাকুরের যুগধর্মসংস্থাপনরূপ নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা তাঁকে কিছুই বুঝতে পারি নি। নিজের ঐশ ভাব এত গোপন করে থাকতেন যে, তাঁকে কিছুই বুঝবার জো ছিল না। তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন আর স্বামীজী কতকটা বুঝেছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাবার পূর্বে একমাত্র মাকে বলেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্র পারে পাড়ি দিয়েছিলেন। মাও তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—'বাবা, তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এস; তোমার মুখে সরস্বতী বসুন।' হয়েছিলও তাই। মায়ের

১ হে দেবদেব, তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ঐশ্বর্য, তুমিই আমার সর্বস্ব।

২ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতাঃ দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ।।

আশীর্বাদে স্বামীজী বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি কখনো এও বলতেন যে, মা ঠাকুরের চাইতেও বড়। এত গভীর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের উপর! ঠাকুরও বলেছিলেন—'নহবতে যে আছে সে যদি কোন কারণে কারো উপর বিরূপ হয়, তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যতীত।'

জগতের সমগ্র নারীজাতিকে জাগাবার জন্য মহাশক্তিরূপিণী মা এসেছিলেন নরদেহে। দেখ না, মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা এখন নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর। এখনো হয়েছে কি? এই তো সবে মাত্র আরম্ভ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারীচরিত্রের বিকাশ হয়েছিল, এ যুগে মেয়েদের ভিতর তার চাইতেও বড় বড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরো আসবে। এসব ঐশী শক্তির খেলা। সাধারণ মানুষ এ-সকলের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।

মেয়ে ভক্ত—আমি তো মা-ঠাকরুনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি নে। তাঁর জীবনী বা উপদেশ কিছুই পড়ি নি। আপনি তাঁর সম্বন্ধে দয়া করে কিছু বলুন। আমার শুনতে খুবই ইচ্ছা হয়।

মহাপুরুষজী—মা তো সকলেরই মা ছিলেন। তাঁর কত দয়া, কত ক্ষমা, আর কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা ছিল। মাকে আমরাই বা কতটুকু জেনেছি? তবে তিনি কৃপা করে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। তাঁর স্বরূপ যে কি, তা তিনি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝবার উপায় নেই। প্রথমটায় যোগীন মহারাজ পরে শরৎ মহারাজ মায়ের খুব সেবা করেছিলেন। আমিও একবার জয়রামবাটী গিয়ে মাকে রান্না করে খাইয়েছিলাম। সে বহু দিনের কথা—ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে। মা তখন জয়রামবাটী রয়েছেন। আমি, শশী মহারাজ ও আর একজন কে ছিল তা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় খোকা মহারাজ—আমরা তিন জন মাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। তখন জয়রামবাটীতে ভক্তেরা বড় একটা কেউ যেত না, আর যাতায়াতেরও খুব কষ্ট ছিল। আমরা আগে থেকেই মাকে খবর দিয়েছিলাম। আমাদের দেখে মার কত যে আনন্দ! কি খাওয়াবেন, কি করে আমাদের সুখী করবেন—তাই নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। জয়রামবাটী তো খুব পাড়াগাঁ—জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু তারই মধ্যে মা গয়লাকে বলে দুধের বন্দোবস্ত, মেছুনীকে বলে মাছের যোগাড়, আর নানারকমের তরিতরকারি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কলকাতার লোকদের চা খাবার অভ্যাস আছে, মা তা জানতেন। তাই আমাদের জন্য চায়ের যোগাড় করে রেখেছিলেন। সারাদিন তো বেশ আনন্দে কেটে গেল। আমরা তালপুকুরে খুব নেয়েছিলাম। মা আমাদের সামনে বড় একটা বেরুতেন না, কথাও বলতেন না।

রাত্রে খেয়েদেয়ে শোবার পরে শশী মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, পরদিন মাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। পরদিন সকালে চা-টা খাওয়ার পরে মার কাছে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করাতে মা তো প্রথমটা হেসেই আমাদের কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন—'সে কি হয়, বাবা? তোমরা আমার কাছে এসেছ, আমি মা, কোথায় আমি তোমাদের রান্না করে খাওয়াব, না তোমরা বলছ রান্না করে আমায় খাওয়াবে। আর তোমরা রাঁধতে পারবে কেন? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের চোখ জ্বলে যাবে।' ইত্যাদি অনেক আপত্তি দেখালেন। আমরা মার কথা কিছুতেই শুনলাম না, খুব জেদ করতে লাগলাম। শেষটায় আমি বললাম—'আমাদের তো ব্রাহ্মণশরীর, আমাদের হাতের রান্না খেতে আপনার কেন আপত্তি হবে? ঠাকুরও তো আমার হাতের রান্না খেয়েছিলেন,' ইত্যাদি। অগত্যা মা রাজি হলেন। শশী মহারাজ ও আমি রান্না করলাম। মা খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

মেয়ে ভক্ত—মহারাজ, আপনি ঠাকুরকেও রেঁধে খাইয়েছিলেন?

মহাপুরুষজী—হাঁ, মা! ঠাকুরের শরীর তখন খুবই অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য কাশীপুর বাগানে রয়েছেন। স্বামীজী প্রভৃতি আমরা সকলেই তাঁর সেবার জন্য ওখানে থাকতাম। আমরা পালা করে রাত-দিন সমভাবে তাঁর সেবায় নিযুক্ত আছি, সকলের খাওয়া দাওয়াও ওখানেই হতো। সুরেশবাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রান্না করার জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণও ছিল। একবার পাচক অসুস্থ হওয়ায় আমরা নিজেরাই পালা করে রান্না করছিলাম। খুব সাধারণ রান্না—ভাত, রুটি, ডাল, চচ্চড়ি, ঝোল—এই রকম। তখন আমাদের সকলকার মনের অবস্থা এমন যে, খাবার দিকে কারুরই আদৌ মন ছিল না—যা জুটত তাই কোন রকমে খেয়ে নিতাম। একে তো ঠাকুরের অমন কঠিন অসুখ, তার উপর আমরা সকলেই তখন খুব কঠোর সাধন-ভজন করছি। সেই সময় একদিন রাত্রে আমি সকলের জন্য রান্না করছিলাম—ডাল, ভাত, রুটি, আর চচ্চড়ি। চচ্চড়িতে যখন ফোড়ন দিয়েছি, ঠাকুর উপর হতে সে ফোড়নের গন্ধ পেয়ে জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁরে, কি রান্না হচ্ছে রে তোদের? বা! চমৎকার ফোড়নের গন্ধ ছেড়েছে তো! কে রাঁধছে?' আমি রাঁধছি শুনে তিনি বললেন—'যা, আমার জন্য একটু নিয়ে আয়।' সেই চচ্চড়ি ঠাকুর একটু খেয়েছিলেন। তখন তো ঠাকুরের কঠিন গলার অসুখ—কোন জিনিসই খেতে পারতেন না। সামান্য একটু দুধে সুজি সিদ্ধ করে দেওয়া হতো, তাই অতি কষ্টে খেতেন। সব সময় তাও খেতে পারতেন না। তার উপর মুহুর্মুহুঃ এত ভাবসমাধি হতো যে, বাহ্যিক কোন হুঁশই থাকত না। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবায় ও ভজন-সাধনে কী আনন্দেই না আমাদের দিন কাটত! আমাদের সকলকে একত্রিত করে ভাবী সঙ্ঘের সৃষ্টি করবেন বলেই যেন ঠাকুরের ঐ অসুখ। অবতারের লীলার গূঢ় রহস্য সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে?

এই বলতে বলতে মহাপুরুষজী একেবারে নির্বাক ও স্থির হয়ে গেলেন! খানিক পরে ধীরে ধীরে বললেন—হাঁ মা, তোমাদের জয়রামবাটীর কথা বলছিলাম। সেবারে মায়ের কাছে আমরা কয়েক দিন মহা আনন্দে কাটিয়েছিলাম। আহা, মায়ের কি স্নেহ! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সর্বদাই মহাব্যস্ত থাকতেন—যাতে আমাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। আমার তো অল্প বয়সে গর্ভধারিণী মা মারা গিয়েছিলেন; ঠিক মায়ের স্নেহ-যত্ন যে কি জিনিস—তা আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়ে সেই স্নেহ-যত্ন পেয়েছিলাম। কয়েক দিন পরে এক রাত্রে আমার খুব কেঁপে জ্বর এলো। সন্ধ্যা থেকেই একটু একটু জ্বরভাব বোধ করছিলাম; তার উপরই খেয়েছিলাম। মার কাছে তো না খাবার জো ছিল না! রাত্রে যখন শুলাম তখন খুব কেঁপে জ্বর। যত রাত বাড়তে লাগল জ্বরও তত বেশি হতে লাগল। সারা রাত একরকম বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাত্রে শশী মহারাজকে ধীরে ধীরে ডেকে বললাম—'ভাই, আর নয়। এখানে জ্বর নিয়ে থাকলে মাকে খালি কষ্ট দেওয়া হবে। কাল সকালেই মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। তারপর যা হবার হবে।' শশী মহারাজও তাতে রাজি হলেন। ভোর হতেই আমরা তিনজন মাকে প্রণাম করে রওনা হলাম। এত শীঘ্র শীঘ্র চলে আসছিলাম বলে মা প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিলেন। শেষে আমাদের ঝোঁক দেখে আর কিছু বললেন না।

## বেলুড় মঠ

২৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ (৭ মে, ১৯২৯)

একজন ভক্তের প্রাণে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। সে তাহার ইচ্ছা মহাপুরুষজীকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন—সে আমি কি জানি? তোমার আন্তরিক সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তো ব্যস, বেরিয়ে পড়। যদি সংসার অনিত্য বোধ হয়ে থাকে তো উত্তম কথা। কোথাও চলে যাও, খুব সাধন-ভজন কর। তাতে আমার আদেশের বা নিষেধের কি প্রয়োজন? ভগবানের নাম সম্বল করে সংসারত্যাগ করে চলে যাওয়া, সে তো মহাভাগ্যের কথা। তাঁর কৃপা হলেই কেবল তা সম্ভব হয়। এখন মঠ-মিশনে ঢোকার কোন দরকার নেই। প্রথমটা খুব সাধন-ভজনে ডুবে যাও। পরে যদি কোন আদেশ পাও তো ভাল কথা। তখন মিশনে এসে তাঁর কাজকর্ম করবে।

## বেলুড় মঠ

২৬ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৬ (৯ মে, ১৯২৯)

মহাপুরুষ মহারাজের এক জোড়া পাদুকা পাইবার জন্য একজন ভক্ত খুব মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, পাদুকা পূজা করেন। সে সম্পর্কে মহারাজ বলিতেছেন—পাদুকা পুজো করুক আর যাই করুক, সারবস্তু হলো ভগবানে ভক্তি। ভগবান দেখেন আন্তরিকতা। তিনি হচ্ছেন অন্তর্যামী। ভক্তির সহিত যাই করুক না কেন, তাতেই ভগবান প্রসন্ন হন। এই দেখ না, মাটির শিব গড়ে পুজো করে লোকে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করে, চৈতন্যলাভ করে মুক্ত হয়ে যায়। জিনিস তো মাটির গড়া শিব, তাকেই প্রেম-ভক্তির সহিত পুজো করলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে সেই পুজো গ্রহণ করেন। সেই জড়পদার্থ যা মাটির তৈরি, তাই আবার চিন্ময় হয়ে যায়, জীবন্ত হয়ে উঠে। সকলের সারবস্তু হলো ভক্তি। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানেই জানবে ভগবৎকৃপা রয়েছে। এই বাহ্যিক পূজাদি কেবল উপলক্ষ মাত্র।

## বেলুড় মঠ

৩০ বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩৬ (১৩ মে, ১৯২৯)

সকালবেলা। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। মঠের সাধুবৃন্দ অনেকেই তথায় উপস্থিত, নানাপ্রকার কথাবার্তা হইতেছে। গত কয়েক দিন যাবৎ মঠে সন্ধ্যার পর ক্লাস হইতেছে। মঠের প্রায় সকল সাধুই তাহাতে উপস্থিত থাকেন। সেই প্রসঙ্গ উঠিল। ক্লাসে স্বামীজী-রচিত মঠের নিয়মাবলী পড়া হইতেছিল। এক একটি নিয়ম পাঠ করা হয় এবং তাহা লইয়া আলোচনাদি চলিতে থাকে। সুধীর মহারাজ, কালীকৃষ্ণ মহারাজ প্রভৃতি অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীই ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকেন এবং জটিল প্রশ্নাদির সমাধান করিয়া দেন। ক্লাস সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিলেন—এরূপ আলোচনাদি হওয়া খুব ভাল। এ মঠ, এখানে দিনরাত পুজো, পাঠ, ধ্যান, জপ, সৎপ্রসঙ্গ এসব চলবে।

জনৈক সন্ন্যাসী—আজকাল মঠের নিয়মাবলী পড়া হচ্ছে।

মহারাজ—ও খুব ভাল। স্বামীজীর কথা, ওসব ঋষিবাক্য, সূত্রাকারে লেখা আছে। এক একটি কথার মধ্যে কত কত ভাব নিহিত রয়েছে! সে-সব কথা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করলে অনেক নতুন জিনিস জানতে পারা যায়। মঠে ওসব যত হয় ততই ভাল। প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্যের দিকে নজর দেওয়া চাই। ভগবৎভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, প্রীতি, পবিত্রতা, পরস্পরে ভালবাসা এসবই তো জীবনের উদ্দেশ্য। বাড়িঘর ছেড়ে আমরা

যে এখানে এসেছি, তার মানে কি? কেন এসেছি? কেন এই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এখানে আছি আমরা? কিসে আমাদের ত্যাগের ভাব বাড়বে, তারই জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা করতে হবে।

সামনে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন—কি, তুমি এ ক্লাসে যোগদান কর তো?

সন্ন্যাসী—আজ্ঞে না। সন্ধ্যাবেলা খেটেখুটে এসে খুব ক্লান্তি বোধ করি, তাই থাকতে পারি নে।

মহারাজ—না, এসব শোনা খুব ভাল। স্বামীজী দূরদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সব জানতে পারতেন। তাই এসব নিয়ম করে গিয়েছেন মঠের জন্য। তাঁর কথা আমরা যত আলোচনা করব, যত পালন করব, ততই আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা যে সব সাধু! ভগবানলাভই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সংসার ভারি সাংঘাতিক জায়গা। এখানে পাঁচ রকম কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থেকে ঠিক লক্ষ্যের দিকে চলা বড়ই মুশকিল। কখনো বা পদস্খলন হয়ে যায়। ঠাকুর যেমন বলতেন—'মাঠের উঁচু আলের পথ দিয়ে যেতে যেতে ছেলেদের পা পিছলে যায়। যে ছেলে বাপের হাত ধরে থাকে, সে কখনো বা টাল সামলাতে না পেরে একেবারে হয় তো আল থেকে নিচে পড়ে গেল। কিন্তু যে ছেলের হাত বাপ নিজে ধরে থাকে তার আর পড়বার ভয় নেই।' সেই রকম আমরাও তো এই সংসারের কুটিল, দুর্গম পথে বিচরণ করছি, পড়ে যাওয়ার তো খুবই সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর যদি আমাদের হাত ধরে থাকেন তো আর পড়বার ভয় নেই। তা ঠাকুর আমাদের হাত ধরে আছেনও। নইলে কোথায় কখন পা পিছলে পড়ে যেতাম তা কে জানে? তাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে হয়—'ঠাকুর, তুমি আমাদের হাত ধরে থাক। আমরা তো দুর্বল, পদে পদেই আমাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা; কিন্তু তুমি যদি আমাদের হাত ধরে থাক তবে আমাদের বাঁচোয়া।' তিনি তো আমাদের প্রাণের প্রাণ—ভিতরেই রয়েছেন। কাতরভাবে প্রার্থনা করলেই তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন। তিনি তো যুগাবতার, যুগধর্মসংস্থাপনের জন্যই এই রামকৃষ্ণরূপ ধরে এসেছেন। আমাদেরও তিনি কৃপা করবেন—করছেনও। নইলে এখানে আনবেন কেন? 'জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়'—এ স্বামীজীর কথা বাবা! তিনি যুগ-ঈশ্বর। এ যুগে যে-কেউ তাঁর শরণাগত হবে তার কল্যাণ হবেই। শরণাগতি, আর প্রার্থনা (করজোড়ে)—'ঠাকুর, আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য বাড়িয়ে দাও। আমাদের পবিত্র কর, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা বাড়িয়ে দাও। তুমি হাত ধরে থাক।' ...পরনিন্দা, পরচর্চা, এসব খুব খারাপ। ওতে মনের গতি নিচু হয়ে যায়। যতক্ষণ পারা গেল ভগবানের ধ্যান-জপ, পুজো-পাঠাদি করা গেল, বাকি সময় চুপচাপ থেকে স্মরণ-মনন করা খুব ভাল। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকার আবশ্যকতা ও উপকারিতা খুবই আছে। তাই তো স্বামীজী এ সঙ্ঘের সৃষ্টি করে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেবাদি শুদ্ধ কর্মেরও প্রবর্তন করে গেছেন।

## বেলুড় মঠ

### ৯ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৬ (২৩ মে, ১৯২৯)

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমা। বিকালে বুদ্ধদেবের জীবনালোচনা হইয়াছিল। মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। রাত্রে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি—পত্র, পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত করিয়া তথায় প্রথমে ভজন ও বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করা হয়। পরে শুদ্ধানন্দ স্বামীজী বাংলায় ও অন্য একজন সন্ন্যাসী ইংরেজিতে বুদ্ধদেবের জীবনী, মতবাদ ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আহারাদির পর স্বামী ওঁকারানন্দ মহাপুরুষজীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দু-এক কথার পর বলিতেছেন—আজ খুব দিন। আমাদের এখানেও খুব সুন্দর হলো। বিকেলেও বক্তৃতাদি হয়েছিল।

মহারাজ—হাঁ, খুব দিন বটে। 'Thrice blessed day.' আচ্ছা, সেই গানটি হয়েছিল কি—'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই?'

স্বামী ওঁকারানন্দ—আজ্ঞে না, ও গানটি কারো তেমন ভাল জানা ছিল না।

মহারাজ—ভারি চমৎকার গান, গিরিশবাবুর বাঁধা। এই বলিয়া নিজেই সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—বেশ বেঁধেছিলেন গানটা গিরিশবাবু। ঠিক 'ললিতবিস্তরের' ভাব নিয়ে তিনি এ গান রচনা করেছিলেন। 'ললিতবিস্তরে' এ senseটি (ভাবটি) ভারি চমৎকার আছে। বুদ্ধদেব অবশ্য তখন সিদ্ধার্থ, গোপার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করছিলেন, এমন সময় আকাশপথে অপ্সরাগণ ঐ গান গেয়ে গেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঐ গান শুনে বুদ্ধদেবের চমক ভেঙে গেল। তিনি বলতে লাগলেন—কে এই গান গাচ্ছে? এ যে আমার জানা গান। 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই'—এ যে আমার চিরপরিচিত গান। ঐ গান শুনে বুদ্ধদেবের মনের গতি তখনই ফিরে গেল। আর ভোগবিলাসে মন বসে না, সদা উদাসভাবে থাকেন। রাজা শুদ্ধোদন ঐ কথা শুনে নানাভাবে বুদ্ধদেবের মনের গতি ফেরাবার চেষ্টা করলেন, নানাপ্রকার প্রলোভনের দ্বারা তাঁর মনকে ভোগের দিকে টানতে চাইলেন। কিন্তু তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে, সব চেষ্টাই বিফল হলো। তারপর তিনি এক রাত্রে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ... মধ্যপন্থা সম্বন্ধেও 'ললিতবিস্তর'-অবলম্বনে গিরিশবাবু আর একটি গান রচনা করেছিলেন—

'আমার এ সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার।।
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শতধারে বয় মাধুরী।
বাজে না আলগা তারে, টানলে ছেঁড়ে কোমল তার।।'

...সে এক সময় গেছে—কি ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা! ভগবান যখন জগতে আসেন তখন আধ্যাত্মিকতার একটা স্রোত বয়ে যায়। বহুলোক জ্ঞানালোক পেয়ে ধন্য হয়, বহুলোক পরিত্রাণ পায়।

স্বামী ওঁকারানন্দ—পরেশনাথের পাহাড়েও চব্বিশ-পঁচিশ জন ভিক্ষু সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তার মধ্যে পনের-ষোল জন জৈন ভিক্ষু, বাকি সকলেই বৌদ্ধ।

মহারাজ—এক সময় আমাদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে খুব আলোচনা ও বিচারাদি হতো। সে অনেক দিনের কথা। তখন স্বামীজী প্রভৃতি আমরা সকলে কাশীপুরের বাগানে আছি ঠাকুরের কাছে। স্বামীজীর খুব পড়াশুনা ছিল, আমরাও কিছু কিছু পড়েছিলুম। খুব তর্ক হতো। ঈশ্বর-টীশ্বর তখন কিছুই মানতুম না। আমাদের ঐ রকম আচরণ দেখে আর আর সব ভক্তেরা খুব মর্মাহত হয়েছিল। স্বামীজী নিজে বেশি বলতেন না, আমাকে লাগিয়ে দিতেন। আমি খুব বলতুম। স্বামীজী সব শুনতেন আর খুব মজা করতেন। কখনো কখনো এমন বলেছি যে—শরীরবুদ্ধি আনাও অন্যায়, ওতে ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে; ঈশ্বরের ভাবনা মনকে নির্বিষয় হতে দেয় না। খালি মুখে যে ওরূপ বলতুম তা নয়, ঐ সময় ধ্যানাদিও ঐভাবের হতো এবং দর্শন-টর্শনও হতো ঐ ভাবেরই। তখন অন্যরকম ভাবতেই পারতুম না, ঐ ভাবে এত ডুবে গিয়েছিলুম। ক্রমে ক্রমে ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ঠাকুরকেও বলে দিয়েছিল। তা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন—'ওরা যা বলছে তা ঠিকই বলছে। একরকম অবস্থা আসে যখন সাধক ভগবান মানে না।' সে ভাব অনেক দিন ছিল। যখন ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর আমরা বরানগর মঠে আসি, তখনো ঐ ভাব চলেছে—ভগবান তখনো মানি নে। একদিন ঠাকুর দর্শন দিয়ে বললেন—'ওরে, গুরুই হলো সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছু নেই।' সে কথা শোনা মাত্র মন থেকে ওসব ভাব চলে গেল। তারপর আর মনে কখনো সে ভাব আসে নি। ঠাকুর যুগাবতার কিনা, যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য এসেছিলেন। তিনি সংকীর্ণ বা একদেশী ভাব রাখতে দেবেন কেন?

স্বামী ওঁকারানন্দ—ঠাকুরের কাছে থাকতে থাকতে আপনারা একবার পালিয়ে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন না?

মহারাজ—হাঁ, স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে সেই বোধিতরুমূলে আমরা একত্রে ধ্যান করতে বসি। খুব ধ্যান জমে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ স্বামীজী ভাবাবস্থায় আকুলভাবে কেঁদে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমি স্বামীজীর পাশেই বসেছিলুম। তারপর নিজে নিজেই যেন সহজ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বামীজী পুনরায় আরো গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। পরদিন আমি কথায় কথায় স্বামীজীকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—'মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলুম। সবই তো রয়েছে। এখানে সেই বুদ্ধদেবের ভাব ঘনীভূত হয়ে আছে। তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, তাঁর সেই মহাপ্রাণতা, তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা সবই আছে। কিন্তু তিনি কোথায়? এসব ভাবের ঘনীভূত মূর্তি যে বুদ্ধদেব, তিনি কোথায়? প্রাণে বুদ্ধদেবের বিরহ এত বোধ হতে লাগল যে আর সামলাতে পারলুম না। তাই কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।' বুদ্ধগয়ায় যে কদিন ছিলুম খুব আনন্দেই ছিলুম।

স্বামী ওঁকারানন্দ—বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেব যেখানে পায়চারি করেছিলেন সেখানে শ্বেত পাথরের পদ্ম করে রেখে দিয়েছে।

মহারাজ—হাঁ, সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে তিনি সারারাত কেবল পায়চারি করে বেড়িয়েছিলেন আত্মারাম হয়ে—মনের আনন্দে কেবল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ হইয়াছিল।

## বেলুড় মঠ

৫ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৬ (২১ জুলাই, ১৯২৯)

আজ রবিবার, গুরুপূর্ণিমা। সকাল হইতেই অনেক ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেছেন; তাঁহার শরীর তত ভাল নয়। একজন ভক্ত প্রণাম করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মহাপুরুষজী বলিলেন—শরীর মোটেই ভাল নয়। আর কি ভাল থাকে, বাবা? এখন দিন দিন শরীর ক্ষীণ হয়েই যাবে। শরীরের ধর্মই এই। ষড়্-বিকারাত্মক দেহ, 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।' এখন ক্রমে ক্রমে শেষ বিকারের দিকে দেহ চলেছে। সব দেহেরই এই পরিণাম।

ভক্ত—আপনি ইচ্ছা করলেই তো হয়?

মহারাজ—না বাবা, তা হয় না। সব দেহের একদিন না একদিন নাশ হবেই। 'অদ্য কিংবা শতাব্দান্তে বাজাপ্ত হবে জান না?' দেহের নাশ আছেই। তা এ দেহ ঢের বেঁচেছে। এই তো প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর হলো, আর কতদিন? নাশ তো হবে দেহের আমার তাতে কি? আমি তো আর দেহ নই? তা ঠাকুর কৃপা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলে যাবে, আর আমি সেই দিব্যধামে চলে যাব, যেখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই—অমৃতধাম। সে জ্ঞান ঠাকুর কৃপা করে খুব দিয়েছেন, দিচ্ছেনও।

বেলা আন্দাজ সাড়ে-নয়টার সময় মহারাজ ঠাকুরঘরে গেলেন এবং দুইজন ভক্তকে দীক্ষা দিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আরাম-কেদারায় স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ভক্ত আসিয়া প্রণামান্তে অনুযোগের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজও নাকি দীক্ষা দিলেন?

মহারাজ—হাঁ, ঠাকুরের নাম দিয়েছি।

ভক্ত—আপনার শরীর তো একে খারাপ, তার ওপর দীক্ষাদি দিলে যে আরো খারাপ হবে, মহারাজ!

মহারাজ—তা কি করি বল? লোকে কাতর হয়ে ধরে বসলে তখন আর না দিয়ে পারি নে। লোকের ব্যাকুলতা দেখে প্রাণ বড় আকুল হয়। দেহ থাকলেই সুখদুঃখও থাকবে। আর এ দেহও যে একদিন নাশ হবে, সেও নিশ্চয়। অতএব যতদিন এ শরীর আছে ততদিন একটু লোককল্যাণ করুক। লোকের কল্যাণ করতে করতে যদি দেহ যায়, সেই তো ভাল। একটি লোকেরও যথার্থ হিত যদি এ দেহের দ্বারা হয় তবেই তো দেহসার্থক হলো।

অল্পক্ষণ পরে একজন ভক্ত আসিয়া প্রণামান্তে দাঁড়াইলেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি সকলকে লইয়া ঁপুরীধাম দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সেই কথা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন—তা ভালই হলো। বাপমায়ের কল্যাণ, আর তোমারও ঁজগন্নাথের দর্শন হলো। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভক্ত—আমি আর একবার দর্শন করেছিলাম। তা তখন অকাল ছিল। তাতে অনেকে বলেছিলেন, অকালে দর্শন করলে তার কোন ফল হয় না।

মহারাজ—ওসব, বাবা, আমরা মানি নে। ভগবানকে দর্শন করবে, তাতে আবার কাল অকাল কি? সব কালই কাল। ভগবানকে দর্শন করলে অকালও কাল হয়ে যায়। ভগবান—তিনি চিরমঙ্গলময়। তাঁর দর্শনে কি কখনো অমঙ্গল হয়? এই বলিয়া গান ধরিলেন—

'মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য, তুমি মঙ্গলনিদান।'

বার বার এই গানটি গাহিয়া পরে বলিলেন—স্বামীজী এই গানটি খুব গাইতেন।

## বেলুড় মঠ

### ১০ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৬ (২৬ জুলাই, ১৯২৯)

বিকালে মহাপুরুষজী সবেমাত্র কামানো শেষ করিয়াছেন, এমন সময় বরানগর অনাথাশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। সে কাছে আসিলে দু-এক কথার পর তাহাকে বলিতেছেন—এখন তুমি কি করে চলে যাবে? স—ফিরে আসুক, তারপর না হয় যেও। আর কেনই বা যাবে? ওখানেই কাজকর্ম করেও ঢের সময় পাবে ধ্যান-জপ করবার। ও হলো মনের ব্যাপার। মন যদি ভগবন্মুখী হয়ে থাকে তো সর্বাবস্থাতেই ধ্যান-জপের সময় ও সুবিধে করে নেওয়া যায়। চাই আন্তরিক ব্যাকুলতা। যদি এখানে না পার তো কোথাও পারবে না। ঠাকুর বলতেন—'যার হেথায় আছে তার হোথায়ও আছে।' খুব খাঁটি কথা বাবা! খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর; তিনি ভক্তিবিশ্বাস খুব দেবেন। কেন যাবে? তাঁর কাজ করছ, এ কি কম কথা?

সন্ন্যাসী—কা—যখন তখন যা তা বলে। এই বলিয়া সন্ন্যাসীটি কাঁদিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষজী—আমারও তাই মনে হয়েছিল যে তোমাদের কিছু একটা হয়েছে। কেন সে যা তা বলে? তুমি তো তেমন লোক নও, আমি খুব জানি। তুমি তো নির্ব্বিবাদী লোক, নেহাত ভালমানুষ। তা কা—কে এখানে একবার পাঠিয়ে দিও না। আমি বুঝিয়ে বলে দেব। তুমি, বাবা, কিছু মনে করো না। আর কি জান, পাঁচটা হাঁড়ি এক জায়গায় নাড়াচাড়া করলে একটু ঠোকাঠুকি হয়। তার আর কি করবে বল? এমন হয়ও, আবার চলেও যায়। এক হাতে তো আর তালি বাজে না? ও বলুক না। তুমি সব সয়ে যাবে। তবেই তো গোল মিটে গেল। তোমাকে একটু বেশি সহনশীল হতে হবে, একটু sacrifice (ত্যাগস্বীকার) করতে হবে। তোমরা ঠাকুরের কাজের জন্য দেহ, মন, প্রাণ সব দিয়েছ, তাঁর জন্য সব ছেড়েছুড়ে এসেছ, তাঁর কাজের জন্য এটুকুও করতে হবে। তুমি সব সয়ে যাও, খুব sacrifice করে যাও তাঁর কাজের জন্য। প্রভু তোমার অশেষ কল্যাণ করবেন।

সন্ন্যাসী—আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে তা করতে পারি।

মহারাজ—খুব পারবে। আমি খুব আশীর্বাদ করছি, বাবা, খুব আশীর্বাদ করছি। তুমিও ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাও। তিনি তোমায় আরো শক্তি দেবেন। তোমরা তাঁর জন্য সব ছেড়ে এসেছ, তোমাদের অদেয় তাঁর কিছুই নেই। পাঁচ জন এক জায়গায় মিলে মিশে যদি না থাক তবে তাঁর কাজ হবে কি করে? তাঁর দিকে চেয়ে সব সয়ে যাবে—ভালমন্দ যে যা বলুক। তোমরা সব সাধু, ভাল হবার জন্য, সৎ হবার জন্য এখানে এসেছ। তোমাদের জীবনে আর অন্য কোন বাসনা নেই, কামনা নেই। তোমরা কেবল তাঁকেই চাও। তবে কাজকর্মে থাকতে গেলে সাময়িক একটু-আধটু মনোমালিন্য হয়েই থাকে। সে হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়, খুব স্বাভাবিক। তবে ওসব তোমাদের ভিতরে স্থায়ী নয়। আসে আবার চলে যায়; কারণ তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো ভগবানলাভ। তোমাদের মধ্যে এসব ক্ষুদ্র রাগদ্বেষাদি আসতেই পারে না। এই তো আমাদের ধারণা। আর এই যে সব কাজকর্ম করছ, সবই সেবাজ্ঞানে করছ কি না! এতে তোমাদের মন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এতে তোমাদের স্বার্থবুদ্ধি মোটেই নেই। তবে কি জান, কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সাধন-ভজনও করতে হয়। যখনই সময় পাবে, বসে জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে, আর প্রাণভরে প্রার্থনা করবে। যখনই মনে কোন রকমের দুর্বলতা বা অভাববোধ আসবে, তখনই ঠকুরকে জানাবে। খুব ব্যাকুলভাবে ডাকলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। তাঁর নাম খুব করবে। নামে দেহ মন শুদ্ধ হয়, মনের ময়লা ধুয়ে যায়। তোমরা সাধু হবার জন্য সব ছেড়েছুড়ে এসেছ; ভগবানলাভই হলো, বাবা, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তোমাদের আদর্শ হলো 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'—নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব, নীরব থাকা, এবং যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া—এই অবস্থা। তোমরা তাঁর ভাবে থাকবে। কে কি বলল না বলল তাতে তোমাদের কি?

কথাগুলি শুনিয়া সন্ন্যাসীটি খুব আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপুরুষজীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মহারাজ, এই আশীর্বাদ করুন যাতে নিন্দা, স্তুতি সব এক হয়ে যায়, যেন তাঁতে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।

মহাপুরুষজী তাহাকে যতই সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন সে ততই আকুল হইয়া করুণস্বরে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। মহাপুরুষজী বলিলেন—খুব হবে, বাবা, তোমার ঐ অবস্থা নিশ্চয় হবে। ঠাকুর তোমায় কৃপা করেন বলেই তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন। অল্পক্ষণ পরে অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন—এখন একটু ঠাকুরঘরে যাও। ওখানে বসে জপ কর ও প্রার্থনা কর। তাতে দেখবে মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। পরে ঠাকুরের একটু প্রসাদ নেবে। আর যখনই ফুরসত করতে পারবে, মাঝে মাঝে এখানে আসবে। মঠে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী আছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা কর তো?

## বেলুড় মঠ

১৭ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৬ (২ অগস্ট, ১৯২৯)

সকালবেলা মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা একে একে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন। জান্‌দী আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারী কয়েকদিন যাবৎ মঠে আছে। সে প্রণাম করিলে মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওখানে তো নানা কাজকর্ম আছে। মঠে যে রয়েছ, জপ-ধ্যান করছ তো? সকাল, সন্ধ্যা, আর রাত্রে খুব জপ-ধ্যান করবে। এ বড় জাগ্রত স্থান। স্বামীজী, মাথায় করে ঠাকুরকে এনে এখানে বসিয়েছেন। এখানে ঠাকুরের বিশেষ প্রকাশ। তাছাড়া স্বামীজী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, এঁরা সকলেই এ স্থানে কত সাধন-ভজন করেছেন! স্বামীজী তো শরীরত্যাগই করলেন এখানে। এ স্থানের মাহাত্ম্য কত! সাধন-ভজনের এমন অনুকূল স্থান আর কুত্রাপি পাবে না! জমাটবাঁধা ভাব এখানকার। কত ধ্যান, জপ, পুজো, পাঠ, কত নামকীর্তন এখানে হয়েছে ও হচ্ছে! কত ভক্তসমাগম, কত হোম, কত কি! যে ক-দিন এখানে আছ, খুব ধ্যান-জপ করে আনন্দলাভ করে যাও। যত ধ্যানাদি বেশি করবে তত এ স্থানের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তোমরা ঠাকুরের ভক্ত, তাঁকে ডাকলেই তাঁর সাড়া পাবে, প্রাণে আনন্দ পাবে।

ব্রহ্মচারী—কত সময় মনে কত প্রশ্ন ওঠে, আর মনে করি সে সব আপনাকে বলি। অনেক সময় মনে সন্দেহও উপস্থিত হয়। কিন্তু আপনার সামনে এলেই সব ভুলে যাই, মনে হয় যেন আমার কোন সংশয় নেই, সব মিটে গেছে। আপনার কাছে এলেই নিজেকে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়।

মহারাজ—(সস্নেহে) কি সন্দেহ মনে ওঠে, বল না? যখন যা মনে ওঠে বললেই পার! তবে কি জান, সব সংশয় নিজের অন্তর থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। ঠাকুর তো

আমাদের ভিতরেই রয়েছেন, তিনি হলেন সকলের অন্তরাত্মা। সব সন্দেহ তিনি অন্তর থেকে মিটিয়ে দেন। অবশ্য তাঁকে জানাতে হবে। এই বলিয়া গান ধরিলেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।'

সব তোমার মধ্যে আছে। তবে খুঁজতে হবে বাবা, খুঁজতে হবে।

খানিক পরে অপর একজন ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতে আসিলে তাহার শিখা ছোট দেখিয়া মহাপুরুষজী মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—কিহে, তোমার শিখা যে এত ছোট? ব্রহ্মচারী তুমি, শিখা যে ক্রমে উড়িয়ে দিয়েছ। এ কি? মনে করেছ বুঝি নেড়া হলেই সন্ন্যাসী হয়ে গেলে। বাবা, সন্ন্যাস হলো ভিতরকার জিনিস, ও শিখা কাটলে হয় না।

একটু পরে স্বামী যতীশ্বরানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপুরুষজী বলিতেছেন—কি যতীশ্বর, কবে মাদ্রাজ যাওয়া ঠিক করলে?

স্বামী যতীশ্বরানন্দ—৯ তারিখে যাব মনে করেছি। এর মধ্যে দিনও ভাল নেই। অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, বৃহস্পতিবারের বারবেলা এইসব পড়েছে। তাই ঐ দিনই যাব বলে স্থির করেছি।

মহারাজ—তা বেশ। তবে তোমরা কাজের লোক, তোমাদের অত দিনক্ষণ দেখতে গেলে কি চলে? যাদের কাজকর্ম তেমন নেই তারা উঠতে বসতে পাঁজি দেখে। ঠাকুরও বলতেন যে, যারা ওসব মানে তাদেরই ওসব লাগে। নইলে আর কি? তা ছাড়া তোমরা মার ভক্ত, মা সর্বাবস্থায়ই তোমাদের রক্ষা করছেন, করবেনও। ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লে কোন বিপদ হয় না। তাঁর নামের জোরে বিপদও সম্পদ হয়ে যায়। এই বলিয়া গান ধরিলেন—

'(যে জন) দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়,
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।'

তুলসীদাসের দোঁহাতেও আছে—

'সব তিথি সুতিথি হ্যায়, সব বার সুবার।
উসকো লাগে ভদ্রা যে বিসরে নন্দকুমার।'

যেদিন প্রাণভরে ভগবানের নাম করা যায় সেই দিনই সুদিন।

## বেলুড় মঠ

### ২২ শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৬ (৭ অগস্ট, ১৯২৯)

সকাল প্রায় সাড়ে-সাতটা। মহাপুরুষজী এখন একটু massage (গাত্রমর্দন) করাইবেন, সেজন্য শুইতে যাইতেছেন। এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল কি, মহারাজ?

মহারাজ—হাঁ, রাত্রে ঘুম মন্দ হয় নি।

সন্ন্যাসী—শরীর কেমন?

মহারাজ—(হাসিতে হাসিতে) জব্ তক্ রামনাম লেতা হ্যায় তব্ তক্ তো আচ্ছাই হ্যায়। তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—শরীর মোটের উপর ভাল নয়, দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবে তাঁর ইচ্ছা যতদিন রাখবার ততদিনই থাকবে। তাঁর প্রয়োজন হয় তো এই ভাঙা হাঁড়িতেও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তাঁর ইচ্ছায় সবই সম্ভব, এবং চালিয়ে নিচ্ছেনও। এই ভাঙা শরীর দিয়ে এখনো কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এই দেখ না, চলতে ফিরতে তো পারি নে, তবু তাঁর ইচ্ছায় এ দেহের দ্বারা কাজ তো হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী—নিশ্চয়, মহারাজ! আপনাদের দেহ যতদিন থাকে ততই আমাদের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ। আর ঠিক ঠিক কাজ তো আপনাদের দ্বারাই সম্ভব। আপনাদের এক কথায় যে কাজ হবে, আমাদের শত চেষ্টায়ও তা হবে না।

মহারাজ—সবই তাঁর ইচ্ছা, তিনি দয়া করে যাকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়ে নেবেন, ততটুকুই। আর সে-ই ধন্য, যাকে তিনি কৃপা করে তাঁর কাজের যন্ত্ররূপে select করে (বেছে) নেবেন। তিনি স্বয়ং ভগবান, যুগাবতার হয়ে এসেছেন যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। অতএব তাঁর কাজের সহায়ক হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা হে? ঠাকুরের কি বিশাল ভাব তা সাধারণ মানব কি বুঝবে! ঐ চৌদ্দপোয়া শরীরের মধ্যে যে কি বস্তু ছিল, কি মহাশক্তিই না খেলা করত, তা তিনি নিজে কৃপা করে না বোঝালে কার সাধ্য যে বুঝে?—

> 'কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে?
> বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে?'

তিনি কৃপা করে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে কি করে তাঁকে বুঝবে? দেখতে তো সাধারণ মানুষের মতো—খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই ভেতরে যে এত কাণ্ড তা কি করে লোকে বুঝবে বল! তাঁর বিশাল শক্তির খেলা যত দিন যাবে ততই লোকে দেখতে পাবে। ধর্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা করে কত যে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন! তাঁর বিষয় কত

কথা যে প্রাণের ভেতর (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) গজগজ করছে, কাউকে তো তা বলবার জো নেই! কেউ ওসব বুঝতে পারবে না। তোমাদেরও বলতে পারি নে। এমন কি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যতদিন ছিলেন, তাঁর কাছে প্রাণ খুলে ওসব কথা বলতুম, বলে প্রাণটা খোলসা হতো। তিনিও আনন্দ পেতেন, আমারও আনন্দ হতো। সে-সব অতি গুহ্য কথা। তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে! তিনিও অনেক সময় নিজের অনেক কথা বলতেন। এখন তো আর তা হবার জো নেই। এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণের ভেতরেই রয়ে যাচ্ছে, বলবার লোকই পাই নে। সবই তাঁর ইচ্ছা। তবে আন্তরিক প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোক, তোমাদের কল্যাণ হোক, তোমরা সব শান্তিতে থাক।

## বেলুড় মঠ
### (বিভিন্ন সময়ে)

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যানের পর মহাপুরুষজীর ঘরে মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। তিনি অল্প দুটি-একটি কথা কহিতেছেন। প্রতি কথায় ধ্যানের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। আর কি মধুর হাসি! নিজ জীবনের প্রসঙ্গক্রমে মহাপুরুষজী বলিলেন—আমার ছেলেবেলা থেকেই নিরাকার ভাব ভাল লাগত এবং সেইভাবেই ধ্যান করতুম। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে অবধি সাকারভাবে বিশ্বাস হয়েছে এবং তাতে আনন্দ পেয়েছি।

*　　　*　　　*

অন্য একদিন পূজাদির কথা উঠিলে মহাপুরুষজী বলিলেন—দেখ, আমরা যখন পূজা করতুম, সে ছিল শুধু ভাবের পূজা। এত আড়ম্বর আমাদের কিছুই ছিল না। পূজা করতে বসে ভাবতুম, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যেমন নিজ খাটটিতে বসে থাকতেন, তেমনি প্রত্যক্ষভাবেই এখানেও রয়েছেন; এবং সেইভাবেই তাঁর পা দুখানি ধুইয়ে মুছিয়ে, তাঁকে স্নানাদি করিয়ে কাপড়-চোপড় পরাচ্ছি। তারপর ফুলচন্দন দিয়ে সাজিয়ে ফলমূল মিষ্টান্নাদি খেতে দিতুম, পরে আবার অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন করতুম। তাঁর ভোজন শেষ হলে পান, তামাক দিতুম। তামাক খাওয়া হলে তাঁকে শয়ন করিয়ে তাঁর পদসেবা ও ব্যজনাদি করতুম এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে নিজ ঘরে এসে বিশ্রাম করতুম। তিনি জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ আছেন, এই বুদ্ধিতে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার

সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠিত হতো। মন্ত্রতন্ত্র বিধিমতন কিছু কিছু থাকলেও তার উপর আমাদের তেমন ঝোঁক থাকত না, এবং পূজার কোন আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর, তিনি চান প্রাণের ভালবাসা, আত্মনিবেদন। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে বাহ্যিক আড়ম্বরই তত বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে ভাবভক্তির গভীরতা ক্রমে কমে যাচ্ছে। স্বামীজীর পূজাও ছিল তেমনি। তিনি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রথমে আসনে বসেই অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান লাগাতেন—খুব জোর ধ্যান। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বেশ ধ্যান করে তবে পূজাদি আরম্ভ করতেন। ধ্যানের দ্বারাই সব হয়ে গেল। তারপর ঠাকুরকে স্নান করিয়ে, সমস্ত ফুলে চন্দন মাখিয়ে দু-হাতে নিয়ে বারবার তাঁর শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতেন। সে এক দেখবার পূজা ছিল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে আসতেন। ভোগাদি অন্য কেউ গিয়ে নিবেদন করে দিত। তাঁর পূজার মধ্যে ধ্যানই ছিল বেশি।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—আমরা তো সন্ন্যাসী। ঠাকুরবাড়ি, পূজা ইত্যাদির দরকার আমাদের ততটা নেই। এসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করলেও আমাদের চলতে পারে। কিন্তু এসবের প্রয়োজন বেশির ভাগ এইজন্য যে এখন দিনের পর দিন পৃথিবীর নানাস্থান থেকে সব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা এ মহাকেন্দ্রে আকৃষ্ট হয়ে এসে এসব পূজাদি দেখে ও অনুষ্ঠান করে ধীরে ধীরে পবিত্র হবে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মহদুদার সমন্বয়ভাব গ্রহণ করে ধন্য হবে। সাধারণ অধিকারির জন্য এসব বাহ্য পূজাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই তো শ্রীশ্রীমা-ই প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার প্রবর্তন করলেন। তারপর স্বামীজী প্রভৃতিও পূজাদি সব করে গিয়েছেন।

* * *

একদিন সকালে ধ্যানাদির পর মঠের অনেক সাধুই মহাপুরুষজীর ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। নানা কথাবার্তা হইতেছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, সমুদ্রকে কি ঈশ্বরের প্রতীকরূপে কল্পনা করা যায়?

তদুত্তরে মহাপুরুষজী বলিলেন—সমুদ্র কেন গো? সমুদ্রের তো কূল-কিনারা আছে, আর সর্বত্র থাকেও না। আকাশই তাঁর প্রতীক। অনন্ত অসীম আকাশ প্রতি অণুপরমাণুতেই বর্তমান। বিশ্বের ভিতরবার সবই আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আবার বাইরে বিশ্বের যে দিকে চাই, দেখতে পাই এই আকাশ। দূরে, অতি দূরে অনন্তে কত শত সৌরজগৎ সূর্যের চেয়েও শতগুণ বড়। কত শত নক্ষত্র গগনসমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতন উঠছে, থাকছে, আবার তাতেই বিলীন হচ্ছে! তেমনি ঈশ্বরেওঅনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় অনুমিত বা প্রতীত হয়। আর তিনিই এই অনন্ত নামরূপ প্রকাশ করে প্রত্যেকের ভিতরে এক অদ্বয় অখণ্ড ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছেন। 'তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'—তিনি বিশ্ব প্রকাশিত করে তারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।

*                *                *

একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে নির্জনে পাইয়া জনৈক সন্ন্যাসী সকাতরে বলিলেন—মহারাজ, দিন দিন শরীর তো অপটু হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো সাধন-ভজন করতে পারছি না, তাই ভয় হচ্ছে কি হবে।

মহারাজ—কাঁদ রে কাঁদ। সাধন-ভজনের দ্বারা কি তাঁকে পাওয়া যায়? মানুষের কতটুকুই বা শক্তি, কি-ই বা এমন করতে পারে যাতে তাঁর কৃপার অধিকারি হবে? কিছুই নয়। তাঁর উপর সমস্ত ভার ফেলে নিশ্চিন্ত হও। তাঁর শরণাগত হও, তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দেবেন। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে পাবার জো নেই।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু অহংকার, অভিমান যে যেতে চায় না, কি করি? যতই মনকে বুঝাই না কেন, মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। কেবলই মনে হয় আমরা চেষ্টা করে কিছু একটা অবশ্যই করতে পারি। অথচ এ বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চাইতেও অসম্ভব ব্যাপার, আপনি একটু আশীর্বাদ করুন যাতে অহংকার, অভিমান নাশ হয়ে যায় এবং তাঁর শ্রীচরণে শরণাগতি লাভ করতে পারি।

মহারাজ—তা হবে, বাবা! আমি বলছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কৃতকৃতার্থ হতে পারবে। মানবজীবন ধন্য হয়ে যাবে।

---